প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নিবেদন

আমার বন্ধুবান্ধবগণ অনুযোগ করেন, আমি এখন কিছুই লিখি না। উত্তরে আমি বলি, আমার লেখা এখন অ—চ—ল। তাঁহারা, এমন কি এ ক্ষেত্রের জহুরী, আমার শুভানুধ্যায়ী পুস্তক-প্রকাশক শ্রীমান্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ভায়াও, এ কথা মানিতে চাহেন না। তাই, আমার কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্ত এই বইখানি লিখিলাম।

কার্ত্তিক, ১৩৩১

শ্রীজলধর সেন

হইয়াছে। সেই সংবাদ পাইয়া বাবা বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আমি বাবার নিকট কখনও কোন আবদার করি নাই। পিসিমার বড় অসুখ শুনিয়া আমি বাবাকে বলিলাম, "বাবা, আমি তোমার সঙ্গে দেশে যাব।"

বাবা বলিলেন, "সে কি ক'রে হবে। তোমার পিসিমার অসুখ, বাড়ীতে আর কেউ নাই। আজ যাব, কালই দিদিকে নিয়ে চ'লে আস্‌ব।"

আমি বলিলাম "বেশ ত, আমিও আজ যাব, কা'লই তোমার সঙ্গে ফিরে আসব।"

বাবা নানা আপত্তি করিতে লাগিলেন, আমি আমার জেদ ছাড়িলাম না। অবশেষে তিনি বলিলেন, "তা, সে কথা ত আমি বল্‌তে পারি না। তোমার মা যদি তোমাকে যেতে দেন, আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।"

আমি তখনই মায়ের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "মা, আমি বাবার সঙ্গে দেশে যাব।"

মা আমার এই অন্যায় আবদার শুনিয়া বলিলেন, "দেশে যাবি! সেখানে কি যেতে আছে? সেখানে গেলেই জ্বর

হবে, সে জ্বর কিছুতেই সারবে না। স্কুল কামাই করে কি যেতে আছে ? উনি ত কালই ফিরে আস্‌ছেন।”

আমি বলিলাম “সেই জন্যই ত যেতে চাচ্ছি। একটা রাত্রি সেখানে থাকলেই কি আমাকে জ্বরে ধর্‌বে। এই ত বাবা যখন তখন বাড়ী যান, এক একবার দুই তিন দিনও থাকেন, কৈ তাঁর ত জ্বর হয় না।”

মা বলিলেন, “তাঁর যেতে যেতে অভ্যাস হ’য়ে গিয়েছে, সেখানকার জল বাতাস তাঁর সয় ; তিনি ছেলে বেলায় দেশেই ছিলেন। তাই তাঁর দেশের জল হাওয়া সয়। তুমি গেলেই জ্বরে পড়বে।”

আমি বলিলাম, “তা, তুমি যাই বল না কেন, আমি বাবার সঙ্গে যাবই। তিনি নিয়ে যেতে স্বীকার হয়েছেন, এখন তুমি বল্লেই হয়।”

মা আমাকে কখনও বকেন নাই, আমিও কখন কোন অন্যায় কাজ ও আবদার করি নাই। তিনি যখন দেখিলেন, আমি বাবার সঙ্গে যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি, তখন তিনি অগত্যা সম্মতি প্রদান করিলেন। আমি সেই দিন রাত্রির গাড়ীতেই বাবার সহিত যাত্রা করিলাম।

২

আমাদের বাড়ী রেলের ধারে নহে। রেল ষ্টেসনে নামিয়া পাঁচ ক্রোশ পথ যাইতে হয়। যাহাদের পয়সা আছে, তাহারা ষ্টেশন হইতে পাল্কী করিয়া যায়, অন্য সকলে গোযানে যায়। আমার বাবা তখন হাইকোর্টের উকিল, পসারও বেশ হইয়াছে। তিনি ষ্টেশন-মাষ্টারকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দুইখানি পাল্কীর বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমরা রাত্রি আড়াইটার সময় ষ্টেসনে নামিয়া দেখি, দুইখানি পাল্কী আমাদের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। আর বিলম্ব না করিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ পাল্কীতে চড়িলাম।

কলিকাতায় অনেক পাল্কী দেখিয়াছি, কিন্তু আমার অদৃষ্টে কখন পাল্কী চড়া হয় নাই! সুতরাং এই প্রথম পাল্কীতে চড়িয়া আমার বড়ই আমোদ বোধ হইতে লাগিল। অন্ধকার

রাত্রি, পথে জনমানবের সম্পর্ক নাই, মাঠের মধ্য দিয়া পথ, দুই দিকে শস্য-ক্ষেত্র। এই সকল দেখিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিল। পাল্কী বাহকেরা কেমন একটা সুর করিয়া কি বলিতে বলিতে চলিতে লাগিল। তাহাদের কথা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সেই অন্ধকার রাত্রিতে সেই নির্জ্জন পথে তাহাদের সুর বড়ই মিষ্ট লাগিতেছিল।

আমরা যখন বাড়ী পৌঁছিলাম, তখন ভোর হইয়াছে, কিন্তু গ্রামের লোকজন কেহই তখনও জাগে নাই।

বাড়ীর বাহিরে পাল্কী নামাইলে বাবা তাড়াতাড়ি পাল্কী হইতে বাহির হইলেন।

বাহিরের উঠানের পার্শ্বেই একটা একতলা কোঠা ঘর। সেই ঘরের বারান্দায় একজন লোক শুইয়া ছিল। পাল্কীর শব্দ পাইয়াই সে তাড়াতাড়ি বারান্দা হইতে নামিয়া আসিয়া বাবার সম্মুখে দাঁড়াইল।

বাবা তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন "রামচরণদা, দিদি কেমন আছেন ?"

রামচরণ জ্যেঠা বলিল, "দাদাবাবু, পিসিমার বড় ব্যারাম।" সেই সময় আমিও পাল্কী হইতে বাহির হইলাম।

পরশ-পাথর

রামচরণ জ্যেঠা আমাকে দেখিয়াই দৌড়িয়া আমার নিকট আসিল এবং স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল "খোকাবাবু, তুমিও যে এসেছ ?"

আমি বলিলাম, "পিসিমার ব্যারামের কথা শুনে আমিও এলাম, তাঁকে আজই আমরা কল্‌কাতায় নিয়ে যাব।"

রামচরণ জ্যেঠা বলিলেন, "সে যা হয় হবে, চল বাড়ীর মধ্যে যাই। এ বাড়ী ত কখন দেখ নাই।" এই বলিয়া সে আমাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া চলিল, বাবা আগে আগে যাইতে লাগিলেন।

বাড়ীর মধ্যে একটা দোতালা কোঠা। তাহার বারান্দায় উঠিয়া বাবা ডাকিলেন "দিদি!" বাবা স্বভাবতঃই বড় মিষ্টভাষী, কিন্তু আজ তিনি যে স্বরে "দিদি" বলিয়া ডাকিলেন তাহা বড়ই মিষ্ট; এমন মধুমাখা ডাক আমি কখনও শুনি নাই।

৩

বাবার ডাক শুনিয়াই ঘরের মধ্য হইতে পিসিমা অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কে রে পরেশ, এসেছিস? ও শ্যামা শীগ্‌গির ওঠ, দুয়োর খুলে দে, পরেশ এসেছে।"

শ্যামাঝির উঠিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পিসিমাই অতি কষ্টে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

বাবা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "দিদি, তুমি এ রোগ-শরীরে বিছানা থেকে উঠলে কেন?" এই বলিয়াই তিনি পিসিমার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিলেন।

আমি তখনও দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলাম; পিসিমা আমাকে দেখিতে পান নাই।

রামচরণ জ্যেঠা তখন বলিলেন, "ওগো, এই দেখ, আর কে এসেছে।"

"কে এসেছে?" বলিয়া পিসিমা দ্বারের বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলেন।

বাবা বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি বিছানায় চল দিদি! যে এসেছে, তাকে দেখতেই পাবে।"

এই কথা শুনিয়া আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিসিমাকে প্রণাম করিলাম। পিসিমা আমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "সুরেশ, তুই এত কষ্ট করে এলি কেন?" তাহার পর বাবার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্ পরেশ, তোর কি বিবেচনা। এই ছেলে মানুষকে সারা রাত জাগিয়ে, একবার রেলে একবার পাল্কীতে এখানে নিয়ে এলি কেন? ওর যে অসুখ করবে। তুই এত বড় হলি, তবু তোর জ্ঞান-বুদ্ধি হল না। আহা, দেখ্ দেখি বাছার আমার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে। তা এখানে কি কিছু পাওয়া যায়? এ কি তোদের কলকাতা সহর? থাক্‌গে, ও রামচরণদা, শীগ্‌গির একটা কাজ কর, গরু দুইটা দুইয়ে ফেল। ও শ্যামা, শ্যামা কোথা গেল! ও শ্যামা, ওরে, বাহিরের ঐ উননটা ধরিয়ে ফেল্, তাড়াতাড়ি করে একটু দুধ গরম করে দে। দেখ্ দেখি, আমি বিছানায় পড়ে আছি, কে বা ওকে দেখবে, কে বা শুনবে।"

বাবা বলিলেন "সে আমি করব। ও একেবারে জিদ্ ধরল, কাজেই সঙ্গে নিয়ে আস্‌তে হল।"

রামচরণ জ্যেঠা বলিল, "তা এসেছে, বেশ করেছে; নিজের বাড়ী ঘর দেখ্‌বে না? এই দেখ না, কল্‌কেতায় থেকে থেকে এক একজনের চেহারা হয়েছে। যেমন বাপটী তেমনি ছেলেটী, ছুইটীই তালপাতার সেপাই। জান ত দিদি, কল্‌কাতার বাবুগুলো না খেয়েই মরে। এই ধর না দুধ, কল্‌কাতায় এক সের দুধে তের ছটাক জল। তাতে কি শরীর থাকে। থাকৃগে সে কথা। খোকাবাবু, তুমি একটু বসো, আমি চট করে গাই দুটো দুইয়ে আসি।" এই বলিয়া রামচরণ জ্যেঠা চলিয়া গেল।

তখন বাবা পিসিমাকে বলিলেন "দিদি! তুমি এত কাতর হয়ে পড়েছ, তা আগে সংবাদ দাওনি কেন? এ তোমার ভারি অন্যায়!"

পিসিমা বলিলেন "সামান্য একটু জ্বর, তার আবার সংবাদ দেব কি? কাল জ্বরটা একটু জোরে এসেছিল, তাই আজ বড় দুর্ব্বল করে ফেলেছে। সে কিছু না, আর জ্বর আস্‌বে না, দুই দিনের মধ্যেই উঠে-হেঁটে বেড়াতে পারব।"

আমি বলিলাম, "পিসিমা, আজ তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে ; আমি সেই জন্যই এসেছি।"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাবা, কলকাতায় যেতে হবে কেন ? তোর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে না কি ?"

আমি বলিলাম, "পিসিমার ঐ এক কথা। ওগো, সে সব কিছু নয়। তোমার এই অসুখ, তোমাকে কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। তাই আমি এসেছি।"

পিসিমা তেমনই সহাস্য বদনে বলিলেন, "তা সে কাজটার ভার বুঝি তুই তোর বাপের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারিস্ নি।"

বাবার দিকে চাহিয়া পিসিমা বলিলেন, "শুন্‌লি পরেশ, তুই যে অকর্ম্মা তা তোর ছেলেটা পর্য্যন্ত বুঝে নিয়েছে। সে কথা যাক্, আমি এখন কলকাতায় যাব কেন ? এমন কি হয়েছে যে, তোরা কাজকর্ম্ম লেখাপড়া ফেলে এত কষ্ট করে ছুটে এসেছিস্। আর আমি ত এখানে জলে পড়িনি, গাঁয়ের দশজনই আছে। তোদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। তা এসেছিস্ বেশ করেছিস্ ; তবে ছেলেটা এল, ভালটা-মন্দটা যে নিজে হাতে ক'রে রেঁধে খাওয়াব তাও অদেষ্টে নেই।"

পরশ-পাথর

বাবা বলিলেন, "দিদি, তুমি ওসব কিছু ভেব না। এখন বল, আজ রাত্রের গাড়ীতে কলকাতায় যাবে কি না?"

পিসিমা বলিলেন, "তোরা হাতমুখ ধো, ঠাণ্ডা হ, কিছু খা, তার পর সে কথা হবে, সারাদিনই পড়ে আছে। বাবা, কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেল গে। ও শ্যামা, ওরে এদিকে আয়। সুরেশ ত কখন গাঁয়ে আসে নি, ওকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দে।"

আমি বলিলাম, "পিসিমা, তুমি শুয়ে পড়, আমরা সব ক'রে কর্ম্মে নিচ্ছি।"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "এতটুকু ছেলের কথা শোন, উনি সব করে-কর্ম্মে নেবেন। আরে, তোর বাপও যে এখনও সব ক'রে-কর্ম্মে নিতে শেখেনি, আর তুই শিখে নিয়েছিস্।"

বাবা বলিলেন "দিদি, ওরা আজকালকার ছেলে, একটু চট্‌পটে বেশী; আর ওদের ত তোমার মত দিদির হাতে মানুষ হবার সুবিধে হয় নি যে একেবারে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাক্‌বে। এখন তুমি একটু শুয়ে পড়, আমরা বাহিরে যাই। চল সুরেশ!" এই বলিয়া বাবা বাহিরে গেলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

৪

আমি কখনও পল্লীগ্রামে যাই নাই। আমাদের এই বাড়ী দেখিয়া আমার বড় আনন্দ বোধ হইল। কত বড় বাড়ী; চারিদিকে কত স্থান! প্রকাণ্ড একটা বাগান, তাহাতে নানা রকমের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বাগানের পার্শ্বেই গোয়াল-বাড়ী। সেখানে অনেকগুলি গরু রহিয়াছে।

আমি রামচরণ জ্যেঠাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামচরণ জ্যেঠা, এ সব কি আমাদের?"

রামচরণ জ্যেঠা হাসিয়া বলিল, "সবই তোমাদের।"

তখন বাড়ীর পশ্চাৎ দিকের বাগানে গেলাম। সেটিও বড় ছোট নয়; আর সে বাগানে আম, কাঁঠাল, লিচু গোলাপজাম, পেয়ারা, খেজুর, তাল, তেঁতুল কত যে গাছ, তাহা আর বলা যায় না। এই বাগানের মধ্যে দুইটা পুকুর

আছে। একটা ছোট আর একটা বড়। বড় পুকুরটার তিনটা বাঁধা ঘাট।

আমি রামচরণ জ্যেঠাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ পুকুর দুইটায় মাছ আছে?"

রামচরণ জ্যেঠা বলিল, "অনেক মাছ আছে। জেলে-পাড়ায় খবর দিয়েছি; আর একটু বেলা হ'লেই তারা এসে মাছ ধরে দিয়ে যাবে।"

আমি বলিলাম, "তা হলে দেখছি, তোমরা মাছ, তরকারী দুধ এসব কিছুই কিনে খাও না।"

রামচরণ জ্যেঠা বলিল, "এ সব কেন, আমরা চা'ল, ডাল, তেল কিছুই কিনিনে। যখন-তখনই যে তোমাদের জন্ত কলকাতায় জিনিষ নিয়ে যাই, সে সব কি কিনে নিই?"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা রামচরণ জ্যেঠা, এমন সুন্দর বাড়ী, এমন বাগান পুকুর, গরু, এত লোকজন থাকতে আমরা কল্‌কাতায় পড়ে মরি কেন? সবাই বাড়ী থাকলেই হয়। বাবার কল্‌কাতায় না থাকলে চলে না। তিনি না হয় সেখানে থাকুন, প্রতি শনিবারে বাড়ী এলেই হয়। শুনেছি, এখানেও একটা ভাল স্কুল আছে, তা হ'লে ত আমার

পড়ারও অসুবিধা হবে না। দেখ, রামচরণ জ্যেঠা, আমাদের সেই কলকাতার বাসাটা কি? একটু জায়গা নেই; দুটো গাছ পুঁতিবার যো নেই, একটু চল্‌বার ফিরবার স্থান নেই। কেমন?"

রামচরণ জ্যেঠা আমার সকল কথাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

৫

এই সময়ে বাড়ীর মধ্য হইতে শ্যামা ঝি আসিয়া আমাকে ডাকিল। বলিল, পিসিমা আমাকে ডাকিতেছেন।

আমি বাড়ীর মধ্যে যাইয়া দেখি, পিসিমা আর বিছানায় শুইয়া নাই। নিজে বঁটি লইয়া বসিয়াছেন, আর বাবা তাঁহার সম্মুখে মেজেয় বসিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতেছেন।

আমি যাইতেই পিসিমা বলিলেন, "সুরেশ, কোথায় গিয়েছিলি? তোর জন্যে জলখাবার তৈরি করে রেখেছি। এখানে ত কিছু পাওয়া যায় না বাপধন! আগে যদি খবর পেতাম, তা হ'লেও না হয় রসিকলালকে ব'লে দিতাম, সন্দেশ রসগোল্লা তৈরি করে রাখ্‌ত। যা আছে তাই খা। দেখি, ওবেলা যদি কিছু করে দিতে পারি।"

আমি জলখাবারের আয়োজন দেখিয়াই অবাক্।

আমি বলিলাম, “পিসিমা, আমি কি তোমাদের বাড়ীতে কুটুম্ব এসেছি। এত সব তুমি কোথায় পেলে। বাবা, দেখেছ, তুমি কাল কলকাতায় মার্কেটে খুঁজে আম পেলে না, আর এখানে আম পেকেছে। হ্যাঁ পিসিমা, এ আম তুমি কোথায় পেলে ?”

পিসিমা বলিলেন “কেন ? আমাদের বাগানে। আমাদের বাগানে দুইটা বারমেসে গাছ আছে, তাতে বারমাসই আম হয়।”

আমি তখন খাইতে আরম্ভ করিলাম। আমরা কলকাতাতে কত রকম ফল খাই, কিন্তু সে সব ত এমন মিষ্ট নহে, এমন সুস্বাদ ত কোন ফলেরই নাই।

জল খাইয়া বাহিরে আসিয়াছি, এমন সময়ে গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই-একজন কলিকাতায় আমাদের বাসায় গিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের প্রণাম করিলাম ; তাঁহারা কাহাকেও প্রণাম করিলেন, কাহারও প্রণাম গ্রহণ করিলেন।

শেষে বাবা আমাকে বলিলেন, “সুরেশ, ইনি মুনীন্দ্র। তোমার কাকা হন।”

আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

"এ তোমার দাদা রমেশ, একে প্রণাম কর।" তাহাই করিলাম।

এমন করিয়া সকলকেই প্রণাম করিলাম। রামচরণ জ্যেঠা সেই স্থানেই একটা মাদুর বিছাইয়া দিল ; তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলেন এবং নানা প্রকার গল্প আরম্ভ করিলেন।

আমরা যখন এই সকল কথাবার্ত্তা বলিতেছি, তখন শ্যামা ঝি আমাকে বাড়ীর মধ্যে যাইবার জন্য ডাকিতে আসিল।

আমি বলিলাম, "একটু পরে যাচ্ছি।"

শ্যামা সে কথা শুনিল না, সে বলিল, "না, না, এখনই চল দাদাবাবু, নইলে পিসিমা রাগ করবেন। তিনি তোমার জন্য বসে অছেন!"

আমি তখন রামচরণ জ্যেঠাকে বলিলাম, "রামচরণ জ্যেঠা, জেলেরা এলে আমাকে ডেকো, আমি কখন মাছ ধরা দেখিনি ; মনে থাকে যেন!"

রামচরণ জ্যেঠা বলিল, "খুব মনে থাক্‌বে।"

৬

বাড়ীর মধ্যে যাইয়া দেখি, পিসিমা বিছানায় বসিয়া আছেন। আমি বলিলাম, "পিসিমা, তুমি উঠেছ কেন? অসুখ যে আরও বাড়বে।"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "আমার কি হয়েছে যে আমি শুয়ে থাক্‌বো! কাল একটু জ্বর বেশী হয়েছিল, আর রামচরণ অমনি কি না পরেশকে তার পাঠিয়ে দিয়েছে। ওর জ্বালায় আমি অস্থির। তা যাক্, সুরেশ, এই দুধটুকু আগে খা। তোদের চা খাওয়া অভ্যেস। বাড়ীতে চা নেই। তার বদলে দুধই খা। চায়ের থেকে দুধ বেশী উপকারী।"

আমি বলিলাম, "পিসিমা, আমার দুধ খেতে ভাল লাগে না।"

পিসিমা বলিলেন, "ওরে, এ তোদের কল্‌কাতার দুধ নয় ; এমন দুধ তুই কখনও খাস্‌নি। একটু মুখে দিয়েই দেখ্, ভাল না লাগে, আর খাস্‌নি।"

আমি আর কি করি, নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমেই দুধের বাটী মুখের কাছে লইয়া একটু খাইলাম। দুধ যে এমন মিষ্ট হয়, তাহা আমি জানিতাম না। আমাদের কল্‌কাতার দুধ এর কাছে দুধই নয়।

আমি তখন পিসিমাকে বলিলাম, "পিসিমা, এমন দুধ আমি কোন দিন খাইনি, খুব ভাল দুধ।"

পিসিমা বলিলেন, "কল্‌কাতার দুধ আবার দুধ ; তার বার আনাই জল। আমাদের এখানে কেউ দুধে জল দিয়ে বিক্রী করে না। আমাদের ত বাড়ীতে গাই আছে ; আমরা কখন দুধ কিনিনে। বাটী দুধ সবটা এক চুমুকে খেয়ে ফেল বাবা। তারপর এই আতাটা খেতে হবে। আমাদের পাড়াগাঁ, এখানে ত আর নানা রকমের খাবার মেলে না !"

আমি বলিলাম, "কেন, এখানে খাবারের দোকান নেই ? সকলে তা হলে কি খায় ?"

পিসিমা বলিলেন, "আমাদের পাড়াগাঁয়ে মিঠাই সন্দেশ দিয়ে কেউ জল খায় না। মুড়ি, চিঁড়ে, গুড়, বাতাসা আর দুধ এই সবই পাড়াগাঁয়ের জলখাবার।"

আমি বলিলাম, "ভদ্রলোকে চিঁড়ে মুড়ি খায়! সে কেমন কথা; অসুখ করে না। পিসিমা, আমি একদিন এক এক পয়সার মুড়ি কিনে এনেছিলাম, একটাও মুখে দিতে পারিনি। মুড়ি দেখেই মা একেবারে 'সর্ব্বনাশ' বলে উঠলেন, আর আমার হাত থেকে মুড়িগুলো কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলেন, বল্‌লেন, 'মুড়ি খেলে ভয়ানক পেটের অসুখ হয়, তাতে মানুষ মরে যেতেও পারে।' হ্যাঁ পিসিমা, মুড়ি খেলে কি অসুখ করে? তা হ'লে এখানে সকলে খায় কেন?"

পিসিমা বলিলেন, "জানিস্ কি সুরেশ, খাওয়া-দাওয়া ওটা অভ্যাস। ছেলে-বেলা থেকে যার যেমন অভ্যাস হয়, সে তাই খেতে পারে। তোরা ত কখনও মুড়ি চিঁড়ে খাস্ নি, তাই তোরা যদি এখন খাস্ তবে তোদের অসুখ করবে। আর যারা বারমাস খায়, তাদের কোন অসুখই করে না। পরেশ কিন্তু বলে যে, মুড়ির মত ভাল জলখাবার আর নেই,

ও আমাদের বাঙ্গালী বিস্কুট ; ওতে কারও কোন অসুখ করে না। আবার মুড়ির থেকেও খই ভাল।"

আমি বলিলাম, "পিসিমা, আজ তা হলে আমাকে মুড়ি আর খই খেতে দেবে। এখন নয় বিকেলে, কেমন পিসিমা !"

পিসিমা বলিলেন, "সে যা হয় তখন দেখা যাবে। এখন দুধটুকু খেয়ে আতাটা খা।"

খাওয়া শেষ হইলে আমি পিসিমাকে বলিলাম, "পিসিমা, এ বাড়ী বেশ। কেমন বাগান, কত গাছ, কেমন মাঠ, কেমন পুকুর। আর আমাদের কল্‌কাতার বাসা কেমন বিশ্রী, একটুখানি জায়গা, একটা গাছ নেই, একটা গরু নেই, এমন পুকুর ত মোটেই নেই।"

পিসিমা কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় রামচরণ জ্যেঠা আসিয়া বলিল "বাবাজি, জেলেরা এসেছে ; মাছ ধরা দেখ্‌বে ত এস। তারা পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া আমি উঠিলাম। পিসিমা বলিলেন, "রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখিস্‌নে। পুকুরের পূব ধারে যে বড় তেঁতুল গাছটা আছে, তারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে মাছ ধরা

দেখিস্। রামচরণ দা, ওকে জলের ধারে যেতে দিও না, ছেলে মানুষ পড়ে যাবে। যে মাছটা চাইবে সেইটে তুলো, আর সব পুকুরে ছেড়ে দিও। কল্‌কাতায় পাঠাবার মত একটা বড় রুই কি কাতলা তুলে জিয়িয়ে রেখে দিও, ওদের সঙ্গে দিতে হবে।"

রামচরণ জ্যেঠা "আচ্ছা তাই হবে" বলিয়া আমাকে লইয়া পুকুরের দিকে চলিল।

আমরা পুকুরের নিকট যাইয়া দেখি, তিন চারি জন জেলে বড় একখানা জাল ঠিক করিয়া জলের ধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রামচরণ জ্যেঠা তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, "এখন জলে নাম। ঐ পূবের দিকটায় জাল তুলিস্ রে, আমরা তেঁতুল গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াই।"

আমরা তেঁতুল গাছতলায় গিয়া দাঁড়াইলাম। পুকুরে খুব বেশী জল ছিল না; অনেক স্থানেই গলা জল, দুই একটা জায়গায় ডুব জল। জেলেরা যখন জাল চাপিতে লাগিল, তখন বড় বড় মাছ এমন লাফ দিয়া যাইতে লাগিল, যে, আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। আমি হাঁ করিয়া মাছের খেলা দেখিতে লাগিলাম। রামচরণ জ্যেঠা আমাকে গাছের তলায় দাঁড়াইতে

বলিয়া জলের ধারে গেল। জেলেরা জাল টানিতে টানিতে পুকুরের পূর্ব্বের দিকে আসিতে লাগিল। তখনও কত মাছ লাফাইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "রামচরণ জ্যেঠা, সব মাছ যে পালিয়ে গেল, ধরবে কি ?"

রামচরণ জ্যেঠা বলিল, "যা গেল তা যাক্, এখনও জালে যতগুলি আট্‌কাইয়াছে, তাতে তোমার মত তিনটে ছেলেকে ঢেকে ফেলা যাবে।"

সত্যসত্যই তাহাই হইল। জেলেরা যখন জাল টানিয়া তুলিল, তখন প্রায় সতর আঠারটা মাছ জালে আটকাইয়া গিয়াছে।

রামচরণ জ্যেঠা বলিল, "বাবাজি, কোন্ মাছটা তোমার জন্যে ধরব।"

আমি কোন্‌টার কথা বলিব ভাবিয়া পাইলাম না; আমি বলিলাম "সবগুলোই বেশ মাছ, ওর যে কোন একটা হলেই হবে।"

রামচরণ জ্যেঠা তখন বাড়ীর জন্য মাঝারী রকম একটা রোহিত মাছ ধরিল এবং কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য

একটা বড় মাছ লইল, অবশিষ্ট মাছগুলি জলে ছাড়িয়া দিল।

আমি বলিলাম "রামচরণ জ্যেঠা, পুকুরে এত মাছ!"

রামচরণ জ্যেঠা বলিল, "মাছ ত আর যখন-তখন ধরা হয় না। তোমাদের জন্য মধ্যে-মধ্যে দুই একটা ধরে পাঠিয়ে দিই। থাক্ সব মাছ, তোমার আর খুকীর বিয়ের সময় মাছ অনেক লাগ্‌বে।"

তারপর আমরা মাছ লইয়া বাড়ীতে আসিলাম। পিসিমা মাছ দেখিয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ও বাড়ীর মেজবউকে আস্‌তে বলেছি; সে বেশ রাঁধে। সেই আজ রান্না করবে।"

আমি বলিলাম "পিসিমা, বাবা কোথায় গেলেন?"

পিসিমা বলিলেন, "পরেশ গাঁয়ের সকলের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তোর খোঁজ কচ্ছিল। আমি বল্লুম, তোর আর এবেলা গিয়ে কাজ নেই; ওবেলা তোকে নিয়ে গাঁয়ের সকলের বাড়ী বেড়িয়ে এলেই হবে।"

আমি তখন পিসিমার কাছে বসিলাম। পিসিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেশ, বাড়ী দেখে তোর মন লাগে।"

আমি বলিলাম, "পিসিমা, আমার বেশ লেগেছে। কেমন সুন্দর বাড়ী, কত জায়গা। পিসিমা, আমি যখন ছুটি পাব, তখনই বাড়ী আস্‌বো। তুমি বাবাকে বলে দিও, তা হলে বাবা কি মা কেউ অস্বীকার করবে না।"

পিসিমা বলিলেন, "মধ্যে মধ্যে তোদের ত বাড়ী আন্‌তে ইচ্ছেই করে। কিন্তু কি করবো, বউমার বড় ভয়, তাই আনতে সাহস পাইনে। নইলে তোদের বাড়ী-ঘর, তোরা যদি সর্ব্বদা আসিস্‌, তা হলে বাড়ী কি এমন থাকে, আরও কত শোভা হয়।"

আমি বলিলাম, "পিসিমা, আমি বাড়ীতে আস্‌বই আস্‌ব।"

এমন সময়ে বাবা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সুরেশ, আমাদের পাড়াগাঁ কেমন ?"

আমি বলিলাম, "বাবা, বেশ জায়গা। তুমি আমাদের যখন-তখন এখানে নিয়ে এস না কেন ? ওঃ! পুকুরে যে মাছ বাবা! তুমি এত মাছ কখনো দেখনি।"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "আমি ঢের দেখেছি, তুমিই দেখ নাই!" এই বলিয়া বাবা সেইখানে সানের উপর বসিয়া পড়িলেন।

পিসিমা বলিলেন, "ওরে রামচরণদা, একটা মাদুর বিছিয়ে দে। ও পরেশ, ঠাণ্ডা মেঝেতে বসিসনে, অসুখ করবে।"

বাবা বলিলেন, "দিদি! তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। একটু বসলেই অমনি অসুখ করবে আর কি?"

পিসিমা বলিলেন, "আমি যে কয়দিন বেঁচে আছি, সে কয়দিন ত দেখি-শুনি, তারপর তোদের অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।"

তখন পিসিমা আর বাবা বিষয়কর্ম্মের কথা আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণের মাঠের কথা, কাকে টাকা ধার দিতে হবে, কার কাছ থেকে সুদের টাকা আদায় করতে হবে, কোন্ জমিটা কাকে দিতে হবে, এই সব কথা আরম্ভ হইল। বাবা হাইকোর্টের বড় উকিল; কিন্তু পিসিমার কাছে তিনি একেবারে চুপ।

পিসিমা একবার বলিলেন, "এই বুদ্ধি নিয়ে তুই ওকালতী করিস্ কেমন করে রে?" বাবা হাসিতে লাগিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম, পিসিমা বাবার বড়দিদি নয়, বড় ভাই।

৮

এইবার স্নানের সময় হইল। পিসিমা বলিলেন, "সুরেশ, তুমি পুকুরে ঠাণ্ডা জলে স্নান কোরো না ; তা হলে অসুখ করবে। জল গরম করে দেব এখন ; সেই জলে স্নান কোরো।"

আমি বলিলাম, "তা হবে না পিসিমা, আমি আজ পুকুরের জলে স্নান করব। কেমন সুন্দর জল। সে জল থাক্‌তে আমি একটুখানি জল ঘটিতে ক'রে মাথায় ঢেলে স্নান করবো না।"

পিসিমা আমাকে এমন কর্ম্ম কিছুতেই করিতে দিবেন না, আমিও ছাড়িব না। "দেখ্‌ সুরেশ, আমাদের এই সকল পাড়াগেঁয়ে জল ভাল নয় ; এ জলে নাইলে, কি এ জল পরিষ্কার না করে খেলে জ্বর হবেই হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা পিসিমা, এখানকার জল এমন খারাপ যে বল্‌লে, তার কারণ কি ? জল এত খারাপ কেন ?"

পিসিমা বলিলেন, "খারাপ কেন জানিস্? আমরা জল ভাল রাখ্‌তে জানি না, তাই এমন হয়। এই দেথ না, আমাদের বাগানের মধ্যে ঐ পুকুরটা। ওর জল খুব ভাল ছিল; কোথায় লাগ্‌তো তোমাদের কলকাতার কলের জল! কিন্তু জল ত ভাল থাক্‌তে পারল না। ঐ পুকুরে সকলে স্নান করতে আরম্ভ করল, যত কাপড় ধুতে আরম্ভ করল; যত রকম অত্যাচার হ'তে পারে তাই হ'তে লাগলো। শেষে দুই তিন বছরের মধ্যে পুকুরের জল খারাপ হ'য়ে গেল।"

আমি বলিলাম, "তা, তুমি ত বাড়ী ছিলে, তুমি এসব হ'তে দিলে কেন? সকলকে বারণ ক'রে দিলেই পারতে; বল্লেই পারতে যে, এ পুকুরে কেউ নেমে স্নান করতে পারবে না, কেউ ময়লা কাপড় ধুতে পাবে না। তা হলেই ত জল ভাল থাক্‌ত।"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "না রে পাগল! আমাদের গাঁয়ে-ভুঁয়ে ওসব নিয়ম খাটে না; ওসব কথা কেউ শোনে না। অমন ক'রে বল্‌লে লোকে নিন্দে করে।"

আমি বলিলাম, "বাঃ রে নিন্দা! তোমরা আমার জিনিষ নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে, আর আমি সে কথা বল্‌লেই

আমার নিন্দা। না পিসিমা, তা হ'লে তোমাদের গাঁয়ের মানুষগুলো ভাল নয়।"

পিসিমা বলিলেন, "না সুরেশ, তুমি কথাটা বুঝতে পারলে না। লোকের কোন দোষ নেই। তারা ও-সব কথা বোঝে না। আমাদের গাঁয়ের লোকেরা চিরদিন একই পুকুরে নাইচে, সেই পুকুরেরই জল খাচ্ছে, সেই পুকুরেই কাপড় কাচ্‌ছে, সেই পুকুরেই গরু নাওয়াচ্ছে। এ দিকে যে জল খারাপ হয়, তা তারা জানেও না, বোঝেও না। তাই তারা এমন করে। আর এত কাল ধ'রে যে যা করে আস্‌ছে, তাতে বাধা দিতে গেলে নিন্দে ত হয়েই থাকে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে কি অত ধরা-বাঁধা চলে? তাই পুকুরের জল খারাপ হয়ে যায়।"

আমি বলিলাম, এ সব কথা লোকে বোঝে না কেন? আর যারা বোঝে না, তাদের যদি বলে দেওয়া যায়, তা হ'লে তারাও ত বুঝতে পারবে। এতে ত সকলেরই উপকার।"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ, তুই যখন বড় হবি, লেখাপড়া শিখ্‌বি, তখন বাড়ী এসে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে লোককে এই সব কথা শিখিয়ে দিবি।"

আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "তাই করব পিসিমা,

আমি তাই করব। আমি যদি লেখাপড়া শিখ্‌তে পারি, তা হলে আমি চাকরী বাকরী করব না, একেবারে ডাক্তার হব। তার পর ওষুদপত্র কিনে এনে এই বাড়ীতে বস্‌ব। যারা গরীব তাদের কাছে টাকা নেব না, ওষুদের দামও না। আর যাতে সকলের শরীর ভাল থাকে, ব্যারাম না হয়, মন ভাল থাকে, এই সব কথা লোককে শিখাব। কেমন পিসিমা, এ ভাল কাজ হবে না ?"

পিসিমা আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ভগবান তাই করুন, যেন লেখাপড়া শিখে তুই গরীবের বন্ধুই থাকিস্। মনে থাকে যেন বাছা, আজকের এই কথা। মনে থাকে যেন, লেখাপড়া শেখা শুধু পয়সা উপার্জ্জনের জন্ম নয়, নিজেরা সুখে থাকবার জন্য নয়, বাড়ীতে কোঠা বালাখানা দিবার জন্য নয় ; লেখা পড়া শিখতে হয় পরের জন্য। লেখাপড়া শিখলে মন বড় হয়, মন বড় হ'লে সেই মনের মধ্যে ছোট কিছু থাক্‌তে পারে না। তখন দশজনের কথা মনে হয়। আশীর্ব্বাদ করি বাবা, তুমি মানুষ হও।"

৯

বাবা বাগানের মধ্যে গিয়াছিলেন; আমাদের কথা যখন হইতেছিল, তখন তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পিসিমা আমাকে যে কথা বলিতেছিলেন তাহা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "দিদি, ওকে কি আশীর্ব্বাদ করা হচ্ছে।"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "যে আশীর্ব্বাদ তোমাকে এত কাল ক'রে এসেছি, ওকে সেই আশীর্ব্বাদই করছি।"

বাবা বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করছ যে, পাঁচটা পাশ করুক, উকিল কি হাকিম হোক; আর যেমন করে হোক অনেক টাকা উপার্জ্জন করুক।"

পিসিমা বলিলেন, "এখনকার দিনে এই আশীর্ব্বাদই সকলে করে থাকে। তা আমিও যে তা না করি তা নয়; তবুও সেই সঙ্গে সঙ্গে বলি, তোরা মানুষ হ, তোদের ধর্ম্মে মতি হোক।

শুধু টাকা টাকা করে তোরা ফিরিস্ নে। তোমাকেও সেই আশীর্ব্বাদ করেছি, তোমার ছেলেকেও তাই করছি। কিন্তু পরেশ শুনেছ, তোমার ছেলে কি করবে। ও বলছিল কি, যে, ও ডাক্তার হবে। ডাক্তারী শিখে গাঁয়ে এসে বস্‌বে। গরীব দুঃখীর কাছ থেকে একটা পয়সাও নেবে না, ওষুদের দামও না ; আর যাতে লোকের শরীর ভাল থাকে, গ্রাম ভাল হয়, জল ভাল থাকে, সেই সব কথা সকলকে শিখাবে।"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বেশ, তাই হবে, তুমি ডাক্তারই হ'য়ো। তা, সে ত পরের কথা ; এখন যে ঘুমিয়ে নিতে হবে। কাল সারা রাত্রি জেগে আস্‌তে হয়েছে, আবার আজও রাত্রি জেগে যেতে হবে।"

পিসিমা বলিলেন, "তা আজ না গেলে হয় না পরেশ ? আজকার রাতটা থেকে, কা'ল গেলে ত আর কোন কষ্ট হয় না।"

বাবা বলিলেন "না, কাল আমাকে আদালতে বেরুতেই হবে। একটা বড় মামলা আছে ; সেটাতে উপস্থিত থাকা নিতান্তই দরকার। তা না হলে এক আধ দিন বেশ থাকৃতে পারতাম।"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "ওকালতীকে আবার স্বাধীন ব্যবসা কে বলে? অন্য চাকুরীর একজন মনিব, আর উকিলের দেশশুদ্ধ লোক মনিব। সকলের মন খুসিয়ে চলতে হয়। সুরেশ, বাবা, তুমি কখন উকিল হয়ো না।" এই কথা বলিয়া পিসিমা উঠিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, এমন সময় বাহির হইতে একজন লোক ডাকিয়া বলিল, "বাবু, একটা তার আছে।"

তার! পাড়াগাঁয়ে তারের খবরের নাম শুনিলে সকলেরই মনে ভয় হয়, না জানি কি খবর!

পিসিমা তারের কথা শুনিয়াই দাঁড়াইয়া গেলেন। বাবা তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইয়া তারটা লইলেন এবং তৎক্ষণাৎ খামখানি ছিঁড়িয়া খবরটা পড়িলেন। তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি একটী কথাও বলিতে পারিলেন না।

তাঁহার এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া পিসিমা দৌড়িয়া তাঁহার নিকট গেলেন এবং ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি খবর রে পরেশ! সব ভাল ত? মনিরাণী ভাল আছে? বৌমা ভাল আছে?"

বাবা প্রথমে কথা বলিতে পারিলেন না; পিসিমা

ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তবুও বাবা কিছু বলিতে পারিলেন না। আমি তখন বাবার নিকট গিয়া তাঁহার হাত হইতে টেলিগ্রামখানি লইয়া পড়িলাম। আমাদের পাশের বাড়ীর রমণবাবু তার করেছেন যে, মায়ের কলেরা হইয়াছে, আমাদিগকে শীঘ্র যাইতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া পিসিমারও মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

মায়ের কলেরা হইয়াছে শুনিয়া আমার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। মনে হইল, তবে ত মা বাঁচিবেন না, তবে ত আমি আর মাকে দেখিতে পাইব না। আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, কিন্তু আমার পা দুইখানি অবশ হইয়া আসিল। আমি পিসিমার কোলের কাছে বসিয়া পড়িলাম; একটী কথাও বলিতে পারিলাম না।

পিসিমা আমাকে কোলের মধ্যে টানিয়া বলিলেন, "ভয় কি বাবা! রোগ হয়েছে সেরে যাবে! ভয় কি?"

তিনি মুখে আমাকে সাহস দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শুষ্ক মুখ ও কম্পিত স্বরে আমি তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম।

আমি বলিলাম, "পিসিমা, কলেরা হ'লে কেউ ত বাঁচে না; মাও বাঁচবেন না। চল পিসিমা, আমরা এখনই যাই।"

বাবা এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল।

আমার কথা শুনিয়া তাঁহার যেন জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "দিদি, আর বিলম্ব করলে চলবে না। এখনই যাওয়া চাই।"

পিসিমা বলিলেন, "এখন কি আর গাড়ী আছে; গাড়ী যে সেই রাত্রি বারটায়।"

বাবা বলিলেন, "ষ্টেসনে গিয়ে দেখা যাক্, কোন মালগাড়ী আছে কি না। যদি মালগাড়ী থাকে, তা হ'লে তাতেও যাওয়া যাবে।"

পিসিমা বলিলেন, "সেই ভাল; তোরা দুইজনে তাড়াতাড়ি দুটো ভাত মুখে দিয়ে নে! দাদাকে পাল্কী ডাকতে পাঠাই। এখনই তিনখানা পাল্কী পেলে হয়; নিদেন দুখানা হ'লেও হয়।"

পিসিমা যখন এই কথা বলিতেছেন, সেই সময়ে জ্যেঠা

আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং আমরা চুপ করিয়া বসিয়া আছি দেখিয়া বলিল, "তোমরা এখনও স্নান কর নাই? বেলা যে আড়াই প্রহর হ'তে গেল। অসুখ করবে যে?"

পরক্ষণেই আমার মুখের দিকে চাহিয়া জ্যেঠা বলিল, "তোমাদের কি হয়েছে; সকলে অমন করে বসে আছ যে?"

এইবার পিসিমা বলিলেন, "দাদা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! কল্‌কাতা থেকে তার এসেছে, বউমার শক্ত ব্যারাম হয়েছে। তা—"

পিসিমার কথায় বাধা দিয়া জ্যেঠা বলিল, "শক্ত ব্যারাম! এক রাত্রিতেই শক্ত ব্যারাম! কি, কি হয়েছে?"

আমি বলিলাম, "জ্যেঠা, মার কলেরা হয়েছে।"

জ্যেঠা বলিল, "অ্যাঁ! কলেরা, কলেরা!" বৃদ্ধ আর কথা বলিতে পারিল না, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; তাহার চক্ষুদ্বয় জলে ভাসিয়া গেল।

বাবা বলিলেন, "দাদা, আর ভাবলে কি হবে, কেঁদেও কোন ফল নেই। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। এখন তাড়াতাড়ি আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও। শীগ্‌গির দুখানা পাল্কী নিয়ে এস।"

উঠিতে গেলেন। আমরাও পাল্কীতে উঠিলাম। জ্যেঠা আমাদের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিল।

আমরা যখন ষ্টেসনে পৌছিলাম, তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। বাবা তাড়াতাড়ি ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট যাইয়া তখনই কলিকাতা যাওয়ার কোন মাল গাড়ী পাওয়া যায় কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন।

ষ্টেশন-মাষ্টার বাবুর সহিত বাবার পরিচয় ছিল। তিনি বলিলেন, "একখানি মাল গাড়ী এখনই আসিতেছে ; কিন্তু আমি আপনাকে সে গাড়ীতে যাইতে বলিতে পারি না, কারণ মালগাড়ী যে কখন কলিকাতায় পৌছিবে, তাহার কোনই ঠিক নাই। রাত্রি বারটায় পৌছিতে পারে। তার চাইতে আপনি অপেক্ষা করুন, পৌনে দশটার গাড়ীতে যাইবেন, তাহা হইলে রাত্রি বারটা কি একটার সময় শিয়ালদহে পৌছিতে পারিবেন।

বাবা বলিলেন, "তার পূর্ব্বে পৌছিবার কি কোন উপায় নাই ?"

ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু বলিলেন, "এক উপায় আছে। আপনারা যদি ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট করেন, আর এখনও যদি চাঁদপুর একস্‌প্রেস চুয়াডাঙ্গা না ছাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে চুয়াডাঙ্গায়

তার করিয়া দিয়া এখানে একস্‌প্রেস থামাইয়া আপনাদিগকে তুলিয়া দিতে পারি।”

• বাবা বলিলেন, “তবে তাহাই করুন। এখনই দেখুন, একস্‌প্রেস চুয়াডাঙ্গা ছাড়িয়াছে কি না?”

ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু তখনই চুয়াডাঙ্গায় সংবাদ লইলেন। তখনও একস্‌প্রেস চুয়াডাঙ্গায় আসে নাই। তিনি তখন সেখানে সংবাদ দিয়া আমাদের ষ্টেসনে একস্‌প্রেস থামাইবার ব্যবস্থা করিলেন। বাবা সকলের জন্যই প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিলেন।

একটু পরেই চাঁদপুর একস্‌প্রেস আসিয়া ষ্টেসনে দাঁড়াইল। আমরা তাড়াতাড়ি একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

পিসিমা বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পরেশ, এ গাড়ী কখন শিয়ালদহে পৌছিবে?”

বাবা বলিলেন, “এ গাড়ী ঠিক সাড়ে সাতটায় পৌছিবে। এ গাড়ী সকল স্থানে থামে না, আর খুব শীঘ্র চলে। আমাদের যদি আর আধ ঘণ্টা দেরী হইত, তাহা হইলে আর এ গাড়ী ধরিতে পারিতাম না।”

পিসিমা বলিলেন, "হে মা কালী, বাসায় গিয়ে যেন সব ভাল দেখি। আমি সওয়া পাঁচ টাকার পূজো দেব।"

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় গাড়ী শিয়ালদহে পৌছিল। আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলাম। বাবা গাড়োয়ানকে বলিলেন, "খুব হাঁকিয়ে চল্, শীগ্‌গির যদি ভবানীপুরে পৌছিয়ে দিতে পারিস্, তা হ'লে বকসিস দেব।"

গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

১১

আমরা যখন বাসার নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন দেখিলাম আমাদের বাসার সম্মুখে দুই তিনখানি ঘরের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। বাবা ইহা দেখিয়াই বলিলেন, "বোধ হয় ডাক্তারদের গাড়ী, তাহলে এখনও বেঁচে আছে।" বাবা আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

দেখিতে দেখিতে আমাদের গাড়ী বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল। আমি আগে নামিয়া পড়িলাম। তাহার পর বাবা পিসিমাকে নামাইয়া লইলেন।

দ্বারের নিকটেই আমাদের প্রতিবেশী রমণ বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বাবাকে বলিলেন "কোন ভয় নেই; রোগিনীর অবস্থা ভাল। দুই জন ডাক্তার এসেছেন; কোন ভয় নাই।"

পরশ-পাথর

বাবা সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন, আমি পিসিমাকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলাম। যাইয়া দেখি, উপরের একটা ঘরের মেঝেয় মাকে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের মধ্যে দুইখানি চেয়ারে দুই জন ডাক্তার বসিয়া আছেন। মায়ের পার্শ্বে ঝি বসিয়া আছে।

পিসিমা তখন আর লজ্জা বা সঙ্কোচ না করিয়া ঘরের মধ্যে যাইয়া মায়ের বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। মায়ের অবস্থা কেমন তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব। আমি বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সেই সময়ে মা যেন কেমন একটা শব্দ করিলেন ; পিসিমা বলিলেন, "ও বৌমা, অমন করছ কেন ?"

মায়ের তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু জ্ঞান ছিল ; তিনি ডান হাতখানি একটু তুলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন ; আমি মায়ের বিছানায় গিয়া বসিলাম। মা তখন আমার হাতখানি ধরিয়া পিসিমার হাতে দিলেন, আর তাঁহার চক্ষুর কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

পিসিমা বলিলেন, "ও বৌমা, ও কি ?" এই বলিয়া তিনি মায়ের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।

সেই সময়ে একজন ডাক্তার আসিয়া মায়ের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন এবং উঠিয়া গিয়া দ্বিতীয় ডাক্তারকে চুপে চুপে কি বলিলেন। দ্বিতীয় ডাক্তারও আসিয়া মায়ের নাড়ী দেখিলেন। তারপর উভয়ে বিষণ্ণ মুখে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই বাবাকে সঙ্গে লইয়া একজন ডাক্তার ঘরের মধ্যে আসিলেন। বাবা আসিয়াই বিছানার উপর বসিলেন, এবং মায়ের ডান হাতখানি কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। মা একবার বাবার মুখের দিকে চাহিলেন, কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কথা সরিল না। তখনই একটা প্রবল হিক্কা উঠিল; মায়ের চক্ষু-তারকা স্থির হইয়া গেল। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি নাড়ী ধরিয়াই হাত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সব শেষ হইয়া গেল।

১২

সব শেষ হইয়া গিয়াছে, আমরা মাতৃহারা হইয়াছি। আমি বড় হইয়াছি, আমি সবই বুঝি ; কিন্তু আমার ভাই মণি যে কিছুই বোঝে না, আমার ভগিনী রাণী যে কিছুই বোঝে না। মণিকেও না হয় কোন রকমে ভুলাইয়া রাখিতে পারা যায় ; তাহার বয়স ছয় বৎসর হইয়াছে। কিন্তু রাণী যে একেবারে দুই বৎসরের মেয়ে। তাহার যে মা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে ত পিসিমাকে চিনিত না। তাহাকে লইয়াই মহা বিপদ উপস্থিত হইল। সে দিনরাত শুধু কাঁদে, আর এঘর-ওঘর করিয়া মাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। যাকে দেখে তার মুখের দিকেই চায়, সেই মুখে বুঝি মায়ের মুখ দেখিতে চায়। চারিদিকে খুঁজিয়া চারিদিকে চাহিয়া যখন সেই স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পায় না, তখন সে কাঁদিয়া উঠে।

পিসিমা তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে টানিয়া লইলে, সে বলে, "মার কাছে যাব।"

মায়ের মৃত্যুর পর তিন চারি দিন চলিয়া গেল। এ কয়দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের ব্যবস্থার কথা কেহই বলিলেন না; পিসিমা বাবাকে লইয়া, আমাদের লইয়া ব্যস্ত হইলেন। রামচরণ জ্যেঠা হাটবাজার ঘর-গৃহস্থালী :দেখা প্রভৃতি করিতে লাগিল।

কিন্তু এমন ভাবে কয়দিন চলিবে? বাবাও তিন চারি দিন আর বাহির হইলেন না; ঘরের মধ্যে বিছানায় পড়িয়া থাকেন, আর আমাদের তিন ভাইবোনের কাহাকেও দেখিলে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠেন।" পিসিমা কি রামচরণ জ্যেঠা কেহ এই চারিদিনের মধ্যে কোন প্রকার উপদেশ দিলেন না; কেবল বাবার যথাসময়ে স্নান আহার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিলেন।

চারি দিনের পর একদিন প্রাতঃকালে আমাদের শয়ন ঘরে একখানি ইজি-চেয়ারের উপর বাবা শুইয়া আছেন, এমন সময়ে পিসিমা ও রামচরণ জ্যেঠা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি তখন বাবার পায়ের কাছে মেঝেয় বসিয়া কি একটা

বই পড়িতেছিলাম। পিসিমা আসিয়া আমারই পার্শ্বে মেঝের উপর বসিলেন ; রামচরণ জ্যেঠা দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, ঘর-গৃহস্থালি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্যই তাঁহারা আজ আসিয়াছেন। কিন্তু কে যে আগে কথা কহিবেন, তাহা দুইজনের কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

বাবা সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, "দিদি, তারপর!" এই কথা বলিয়া বাবা একটী হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সে নিঃশ্বাসে যেন তাঁহার বুকের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া গেল।

পিসিমা আমার কাছে বসিয়া ছিলেন। বাবার এই কথা শুনিয়া তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া বাবার কাছে গেলেন এবং তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ভাই, এত অধীর হলে কি চলে? ভগবানের নাম কর। তিনিই মনে শান্তি দেবেন। তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। তোমাকে ত আর উপদেশ দিতে হবে না।" এই বলিয়া পিসিমা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রামচরণ জ্যেঠা এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে

তখন বলিল, "দেখ, যা হবার তা হয়ে গেল। এখন এই তিনটা যাতে মানুষ হয়, বাপ-পিতামহের নাম যাতে থাকে, তারই চেষ্টা কর। সে যদি আমাদের হ'ত, তাহলে কি এমন ক'রে ফেলে চলে যায়। সে সব কথা আর মনে করো না। এখন কি উপায় করা যায় তাই বল। আমরা দুজন যদি এখানে বসে থাকি, তাহলে ওদিক সব ভেসে যায়। আবার তোমাদেরই বা এ অবস্থায় কার হাতে রেখে যাই। তার কি বল? বসে বসে ভাবলে ও কাঁদলে যে সবই যায়। এখন মন বেঁধে যাতে সব দিক রক্ষা পায়, তার ব্যবস্থা কর। শীগ্‌গিরই আমাকে বাড়ী যেতে হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের একটা বিলি ব্যবস্থা না করেই বা কেমন করে যাই।"

রামচরণ জ্যেঠার কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন "দাদা, তোমাকে যে অমনি দাদা বলে ডাকি তা নয়, তুমি সত্যি সত্যিই আমার দাদা, আমার বড় ভাই। আমি কোন দিনই সংসারের কোন কাজ করি নাই; কিছু দেখি নাই। তুমি আর দিদিই সব করেছ। আমাকে কেন ওসব কথা জিজ্ঞাসা কর। দিদির সঙ্গে পরামর্শ করে যা তোমরা করবে, তাই হবে। আমি আর সে সম্বন্ধে কি বলব।"

পিসিমা বাবার কথা শুনিয়া বলিলেন, "সবই ত বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি যে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছি না। বউ যে এমন করে আমাদের অকূল পাথারে ভাসিয়ে যাবে, তা ত একদিনও মনে করি নাই। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। আমি আজ কয়দিন ধরে ঐ সমস্ত কথাই ভাবছি। রামচরণদা, তুমিই এখন আমাদের বল ভরসা, তোমার যা পরামর্শ হবে, আমরা তাই করবো। তুমি কি বল ?"

রামচরণ জ্যেঠা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি এখানে না থাকলে এ সব বাছাদের কে দেখবে ? তাদের একটু কষ্ট হলে যে প্রাণে বড় লাগবে। তারপর যদি ছেলেপিলেদের বাড়ী নিয়ে যাও, তা হলে এখানে ভাইটীর কাছে কে থাকে ? তাকে এমন অবস্থায় একলা ফেলে কি যাওয়া যায় ? তারপর ছেলেপিলেগুলো কাছে থাকলে ওর মনও ধীরে ধীরে শান্ত হবে। ওদের বাড়ী নিয়ে গেলে ও যে কেঁদে কেঁদেই মরবে।"

বাবা বলিলেন, "আমার জন্য তোমরা ভেব না ; যাতে এরা মানুষ হয় তারই ব্যবস্থা তোমরা কর। এখানে না

থাকলে ছেলেটার পড়াশুনার ক্ষতি হবে, আর সে একলা এখানে থাকবেই বা কি ক'রে।"

আমি এতক্ষণ কিছুই বলি নাই। আমি ছেলেমানুষ, আমার কি কথা বলা ভাল দেখায়। কিন্তু যখন আমার কথাই হচ্ছে, তখন আমি একটা কথা না বলে থাকতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "বাবা, তুমিও এখন বাড়ী চল না। আমরা সবাই বাড়ী যাই। আমি সেখানকার স্কুলে পড়ব; সবাই বাড়ী থাক্‌ব। এ বাড়ীতে আর থেকে কাজ নেই।"

পিসিমা বলিলেন, "এখন কিছুদিনের জন্য তাই করাই ভাল।" তাহার পর বাবার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্, তোর এখন যে রকম মনের অবস্থা হয়েছে, তাতে তোকে একলা রেখে আমরা বাড়ী যেতে পারব না। আর তুই এখানে থেকেই বা এখন কি করবি। কাজকর্ম্ম এখন তোর ভালও লাগবে না, তুই করতেও পারবি না। তার চাইতে বাড়ী চল্, দিন কয়েক বাড়ীতে থাক্; তার পরে যা হয় করা যাবে। এখানে আর থেকে কাজ নেই।"

বাবা বলিলেন, "সে কি করে হয় দিদি। কত জনের কাজকর্ম্ম আমার হাতে রয়েছে। সে সব ফেলে গেলে কাজের

বড় ক্ষতি হবে। আমার ক্ষতির কথা বল্‌ছি না, কিন্তু পরের কাজ যে নষ্ট হবে, তার কি ?"

পিসিমা বলিলেন, "আর একজন উকিলকে ডেকে এনে সব বুঝিয়ে দে। তোর মক্কেলদের কাছেও পত্র লিখে দে, তারা যেন সেই উকিলের কাছে এসে দিন কয়েক কাজকর্ম্ম করে ; তারপর এসে তুই সব বুঝে নিস্‌।"

রামচরণ জ্যেঠা বলিলেন, "সেই ভাল। এখন সকলে মিলে বাড়ী যাওয়া যাক্‌। তারপর ভেবে চিন্তে ঠিক করা যাবে।"

বাবা বলিলেন, "তোমাদের দুই জনেরই যখন সেই মত, তখন আর আমি অমত করে কি করবো। এখন দিন কয়েকের জন্য বাড়ীতেই যাব। কি বল দিদি ?"

পিসিমা বলিলেন, "তা হ'লে তুই আর দেরী করিস্‌ নে। আজই সব বন্দোবস্ত করে ফেল ; ওদিকে যে দিন যাওয়া হবে, সে দিনের কথা বাড়ীতে লিখে দে। আমার আর এখানে এক দণ্ডও থাকৃতে ইচ্ছে করছে না ; যত শিগ্‌গীর হয় এখান থেকে তোদের নিয়ে বেরুতে পারলেই বাঁচি।"

বাবা বলিলেন, "আজই আমি সব ব্যবস্থা করছি। কাল আর যাওয়া হবে না, পরশু যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।"

১৩

তাহাই হইল। এতকাল যে বাড়ীতে আমরা ছিলাম, সেই বাড়ী ছেড়ে আমরা দেশে চলিলাম।

দুই দিন পরেই আমরা বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রামের সকলে আসিয়া কত দুঃখ করিতে লাগিলেন, বাবাকে কত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, আমাদের কত আদর করিতে লাগিলেন। এই সব দেখিয়া আমার বেশ ভাল লাগিল। কই, এই ত কয় দিন কলিকাতায় ছিলাম, বাবার জন কয়েক বন্ধু ছাড়া আর কেহই ত আমাদের খোঁজ খবর লইতে আসিলেন না। বাড়ীতে এসে বেশ বুঝতে পারলাম এঁরা সকলেই আমাদের আপনার জন। এঁরা শুধু মুখের কথা বলিতে আসেন নাই; আমাদের এই বিপদ, এই দুঃখ যেন তাঁহাদেরই বিপদ, তাঁহাদেরই দুঃখ।

এই ভাবে মাস কাটিয়া গেল। মায়ের শ্রাদ্ধের দিন আসিল ; কোন রকমে আমি শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ করিলাম।

শ্রাদ্ধের পরদিন আমাদের পুরোহিত মহাশয় আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়া বাবার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। আমি বাহিরের বারান্দায় ছিলাম। সেখান হইতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা বেশ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

পুরোহিত মহাশয় বাবাকে বলিলেন, "দেখ, যা হবার তা ত হয়ে গেল। গতানুশোচনায় কোন ফল নাই। মা ভাগ্যবতী ছিলেন। সতী লক্ষ্মী পতি পুত্র রেখে স্বর্গে চলে গেলেন। কিন্তু বাবা, তোমাকে ত এরূপ ভাবে থাকৃতে দিতে পারি না। তোমার বাবা বেঁচে নেই, আমিই তোমার পিতৃস্থানীয়। তোমার বাবা বেঁচে থাকৃলে যা উপদেশ দিতেন, যা ব্যবস্থা করতেন, এখন আমাকেই সেই সব করতে হবে। আমি ত আর তোমাদের শুধু চাল-কলার পুরোহিত নই। আমরা আজ সাত পুরুষ তোমাদের পুরোহিতগিরি করছি, তোমাদের মঙ্গল কামনা কচ্ছি।"

বাবা বলিলেন, "আমিও কাকাঠাকুর আপনাকে পিতার মত ভক্তি করি। আপনি আমাদের মঙ্গলের জন্য যখন যা

আদেশ করেছেন, তা প্রতিপালন করেছি; আর তাতে আমাদের মঙ্গলই হয়েছে। এখন আপনি আমাকে কি আদেশ করতে চান?"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "দেখ, শাস্ত্র-কথা তোমাকে বলতে হবে না, তুমি নিজেই কত জনকে শাস্ত্রের উপদেশ দিতে পার। আমার কথা এই যে, স্ত্রীই সংসারের শ্রী। সহধর্ম্মিণী না থাক্‌লে সংসারে কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান চলে না। সাধু সন্ন্যাসীর কথা পৃথক; তাঁহারা সংসারের কেহ নহেন। যাদের ঘর-গৃহস্থালী করতে হবে, তাদের গৃহের লক্ষ্মী সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন। এ কথা তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না। সেই জন্যই আমি বল্‌ছি, অনুরোধ করছি, তুমি পুনরায় দারপরিগ্রহ কর।"

বাবা বলিলেন, "আপনার সহিত তর্ক করিয়া অপরাধী হতে চাচ্ছি না; কিন্তু অভয় দিলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। শাস্ত্রে বলে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। পুত্রাদির প্রয়োজনের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন। কাকাঠাকুর, আমার ত দুটি পুত্র একটী কন্যা বর্ত্তমান। তা হ'লে আর ভার্য্যার প্রয়োজন কি? আশীর্ব্বাদ করুন, ওরা বেঁচে থাকুক, মেয়েটি

বেঁচে থাকুক। বছর কয়েক পরে মেয়েটিকে সৎপাত্রে দান করি, ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে বৌ ঘরে আনি ; সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করি।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তুমি যা বল্‌লে তা ঠিক ; কিন্তু দেখ, লোকে প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হলে যা মনে ভাবে তা ঠিক নয় ; কিছু দিন গেলে সে মত প্রায়ই বদ্‌লে যায়। তখন লোকে অন্য রকম ভাবে। স্ত্রী না থাক্‌লে বাবা, সংসারে বন্ধন থাকে না। ছেলে বল, মেয়ে বল, স্ত্রীর সমান কেহ নয়। রোগে শোকে স্ত্রী যা করবে, অন্যে তা কিছুতেই করতে পারে না। তুমি এখন শোকে অধীর হয়ে ঠিক বিবেচনা করতে পারছোনা। কিন্তু একটু ভেবে দেখিও। আমি এখনই তোমার উত্তর চাই না। আমি আর একদিন আসব ; সেইদিন শুন্‌ব।"

বাবা "যে আজ্ঞা" বলিয়া পুরোহিত মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বাবাকে আবার বিবাহ করিতে লোকে উপদেশ দিতেছেন শুনিয়া আমার প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল। আমি চুপে চুপে বারান্দা হইতে নামিয়া বাগানের মধ্যে চলিয়া গেলাম।

১৪

সেই দিনই রাত্রিকালে যখন পিসিমা হরিনাম করিতে বসিয়াছেন, সেই সময় আমি তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম। তখন সেখানে আর কেহ ছিল না, বাবা বোধ হয় গ্রামের মধ্যে কোথাও বেড়াইতে গিয়াছিলেন ; মণি ও রাণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া এ কয়দিন পড়াশুনা ছিল না ; তারপর পিসিমা ও জ্যেঠা মহাশয় যে রকম আদর করে খাওয়াতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আমারও সন্ধ্যার পরই ঘুম আসিত। কলিকাতায় কিন্তু রাত্রি দশটার পূর্ব্বে আমি শয়ন করিতে পারিতাম না, আমার মায়ের এমন কড়া শাসন ছিল। এ দিনে কিন্তু আমার ঘুম আসিল না। সকাল বেলা পুরোহিত মহাশয় বাবার সঙ্গে যে কথা বলিয়াছিলেন এবং দুই এক দিনের মধ্যেই যে কথার উত্তর শুনিবেন বলিয়া

গিয়াছেন, সেই কথাই সারাদিন আমার মনে জাগিতেছিল। কতবার মনে করিলাম, এ কথা আমি ভাবি কেন? কিন্তু তখনই আমার মায়ের মুখ মনে পড়িতে থাকে, আমি চক্ষের জল রোধ করিতে পারি না। যদি বাবা আবার বিবাহ করেন, তাহা হইলে যে আমরা একেবারে পর হইয়া যাইব। বাবা কি তখন আর আমাদের এখনকার মত ভালবাসিবেন।

অবশেষে স্থির করিলাম, রাত্রিতে কেহ যখন পিসিমার কাছে থাকিবে না, তখন তাঁহাকেই কথাটা বলিব। আমার মনে হইল পিসিমা যদি নিষেধ করেন তাহা হইলে বাবা কখনই আর বিবাহ করিতে পারিবেন না,—পিসিমার কথা তিনি কিছুতেই অমান্য করিতে পারিবেন না। আমার বয়স যদিও তখন তের বৎসর, কিন্তু তাহা হইলেও আমি যেন একটু বেশীরকম সকল কথা বুঝিতে শিখিয়াছিলাম। আমার স্থির ধারণা হইয়াছিল যে, পিসিমা কিছুতেই বাবাকে বিবাহ করিতে দিবেন না। তাই পিসিমার কাছে যাইয়া বসিলাম।

পিসিমা হরিনামের মালা না নামাইয়াই আমাকে তাঁহার কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "কি রে সুরেশ, তুই এখনও ঘুমাস নাই। আমি ত তোকে শুতে ব'লে এসে এই

মালা নিয়ে বসেছি ; আর তুই অমনি চলে এলি। মণি রাণী ঘুমিয়েছে ত ?”

আমি বলিলাম, “পিসিমা, আমার ঘুম পাচ্ছে না ; তাই চুপ করে শুয়ে থাক্‌তে পারলাম না, তোমার কাছে ছুটে এলাম। তুমি গল্প কর পিসিমা। না, না—আগে তোমার মালা জপা শেষ কর, ততক্ষণ আমি বসে থাকি। তারপর গল্প বোলো, কেমন পিসিমা ?”

পিসিমা তাঁহার হরিনামের মালা মাথায় ঠেকাইয়া পার্শ্বের দেওয়ালের একটা হুকে ঝুলাইয়া রাখিয়া বলিলেন “আর বাবা, আমার হরিনাম কি আর আছে। সে সব আমার ঘুচে গেছে। মালা নিয়ে বসি, আর রাজ্যের ভাবনা এসে আমার মাথার মধ্যে জড়ো হয় ; নাম করা আর হয় না।”

আমি বলিলাম, “তুমি কি ভাব পিসিমা !”

পিসিমা বলিলেন, “তুই ছেলেমানুষ, কি তার বুঝবি বল।”

আমি বলিলাম, “আমি বুঝি এখনও ছোট আছি। আর দেখ পিসিমা, আগে আমার বুদ্ধি বোধ হয় কম ছিল ; কিন্তু আমার মা চ'লে যাবার পর থেকে আমি কত কথা ভাবতে শিখেছি।”

পরশ-পাথর

পিসিমা আমাকে তাঁহার বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন "তোর ভাবনা কি? মা কি সকলেরই চিরদিন বেঁচে থাকে? এই শোন্ না, আমার যখন এই তোরই মত বয়স, আর পরেশ যখন পাঁচ বছরের, তখনই আমাদের মা মারা যান। তাই বলে কি আর আমরা মানুষ হইনি। মা মারা গেলে কতজন বাবাকে আবার বিয়ে করবার জন্য অনুরোধ করেছিল; তাঁর গুরুদেব পর্য্যন্ত কত বলেছিলেন। বাবা কারও কথা শোনেন নাই। তাঁর সেই একই কথা 'আমার ছেলে মেয়েকে আমি পর করতে পারব না।' তিনি আর বিয়ে করলেন না। আমার বাবার মত তেজী পুরুষ আমি কমই দেখেছি। আমরা ভাই বোন দুইজন কেউই বাবার মত তেজ পাইনি; তবে পরেশ বাবার আর সব গুণ পেয়েছে,—তেমনি সৎস্বভাব, তেমনি পরের দুঃখে দুঃখী।"

আমি বলিলাম, "তুমি কিন্তু পিসিমা, খুব তেজী, জ্যেঠা বলে, তুমি যদি না থাক্‌তে, তা হোলে এসব বিষয়, জমিজমা কিছুই সে রক্ষা করতে পারত না। কেমন ঠিক নয় পিসিমা?"

পিসিমা বলিলেন, "ওকে তেজ বলে না। তেজ কাকে বলে শুন্‌বি। সেই তেজী মানুষ, যে অন্যায় সহ্য করতে

পারে না ; যে, যা উচিত বুঝবে, তার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। তাকেই বলে তেজী। আমরা আর কি করি ; যে প্রজা খাজনা দেয় না, তাকে ডেকে এনে দশটা ধমক দিই। একে তেজ বলে না।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা কেউ যদি অন্যায় কাজ করে, এই ধর না আমি কি বাবা যদি কোন অন্যায় কাজ করতে যাই, আর তোমার যদি তাতে মত না থাকে, তা হ'লে তুমি তেজ দেখাতে পার না ?"

পিসিমা বলিলেন, "খুব পারি বাবা, খুব পারি। যাঁর ঔরসে আমাদের জন্ম, তিনি অন্যায় দেখতে পারতেন না, আমিও পারি না ; তোরাও তা পারবি নে।"

আমি বলিলাম, "পিসিমা, আমি তোমাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছি।"

পিসিমা বলিলেন "কি কথা সুরেশ ?"

আমি বলিলাম, "আজ সকালে পুরুত-ঠাকুর এসে বাবাকে আবার বিয়ে করবার কথা বল্‌ছিলেন। আমি আড়ালে থেকে শুনেছি। তিনি আবার আস্‌বেন বাবার মত জান্‌তে।"

পিসিমা বলিলেন, "পুরুত ঠাকুরের কথা শুনে পরেশ কি বল্‌ল ?"

আমি বলিলাম, "আমি সব কথা শুন্‌তে পাইনি ; তবে যা একটু শুনেছি, তাতে বুঝতে পারলাম বাবার বিয়ে করবার মত নেই।"

পিসিমা বলিলেন, "তবে আর কি। তুই ভয় পাচ্ছিস কেন সুরেশ ? পরেশ কিছুতেই বিয়ে করবে না ; কেমন বাপের ছেলে সে, সে কথা ত এইমাত্রই তোকে বল্‌লাম। আর পরেশ যদি আবার বিয়েই করে, তাতে তোদের কি ? সে কি তোদের অযত্ন করবে ? দেখ, সে সাহসই তার হবে না। আমি তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছি। তার প্রকৃতি আমার জানা আছে। যে তাকে যাই বলুক, দিদিকে জিজ্ঞাসা না করে সে কোন কথাই কাউকে বলবে না, বা কোন কাজ করবে না, এ তুই ঠিক জেনে রাখ।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, বাবা যদি তোমার মত জিজ্ঞাসা করেন, তা হ'লে তুমি কি বল্‌বে ?"

পিসিমা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তার জিজ্ঞাসার রকম দেখলেই আমি তার মনের ভাব বুঝতে পারব। তার

যদি বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়, আমি তাতে বাধা দেব না; কিন্তু এ কথা তাকে বুঝিয়ে দেব যে, এতে আমি খুসী হব না। কিন্তু তোকে বল্‌ছি সুরেশ, পরেশ আমার তেমন ভাই নয়; সে তোর বিয়ে করবার কথা মনেও স্থান দেয়নি; দেবেও না। তার জন্য তোকে ভাবতে হবে না।”

পিসিমার কথা শুনিয়া সত্যসত্যই আমার ভয় দূর হইল; আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

পিসিমা তখন বলিলেন, “এখন চল্‌; তোকে শুইয়ে রেখে দেখি পরেশ এখনও আসছে না কেন?”

পিসিমার কথা শেষ হইতে না হইতেই বাবা সেখানে উপস্থিত হইলেন। পিসিমা বলিলেন, “এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলি রে?”

বাবা বলিলেন, “ওকালতী করছিলাম দিদি! কলকাতা ছেড়ে এসে মনে করলাম, দুচার দিন ও-সব আইনের কচকচি বন্ধ রেখে বিশ্রাম করব। তা কি হবার যো আছে।”

পিসিমা বলিলেন, “এখানে আবার কাদের ওকালতী?”

বাবা বলিলেন, “কেন, তুমি কি জান না মিত্তিরদের বাড়ী মহা গোলযোগ বেধেছে।”

পিসিমা বলিলেন, "সে সব ত জানি ; কেশব কাকার বিধবার সঙ্গে তার বড় সতীনের ছেলের বনিবনাও হচ্ছে না। তোকে বুঝি সালিশ করবার জন্য ডেকেছিল।"

বাবা বলিলেন, "সালিশ আর হচ্ছে না দিদি! বৌটা ভারি সেয়ানা। আমি ত ভেবেই পাইনে, কিসের জন্য বিধবার এত জিদ্। হাঁ, যদি বুঝতাম যে, তারও দুটো ছেলে মেয়ে আছে, তা হলে রসিকের সঙ্গে না হয় একটা বোঝাপড়ার দরকার ছিল। কিন্তু তাও ত নেই ; তবে যে কেন তিনি এমন করছেন, আমি ত বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। রসিক যা বল্‌ল, তাতে তার ত কোন দোষ দেখলাম না।"

পিসিমা বলিলেন, "এ গোলের সৃষ্টি কি এখন হয়েছে ; কেশব কাকা শেষ বয়সে যখন আবার বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠ্‌লেন, তখন আমরা কি কম নিষেধ করেছিলাম। উপযুক্ত ছেলে রয়েছে, তারও একটা ছেলে হয়েছে, মেয়েদেরও ছেলেপিলে হয়েছে ; বয়সও তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে ; সে সময় তাঁর যে কেন মতিচ্ছন্ন হোলো, তা কে বল্‌বে। ছেলে-মেয়ে রয়েছে ; সে অবস্থায় তিনি কারও কথা না শুনে ঐ একটা ধেড়ে মেয়েকে বিয়ে করলেন। তখনই আমরা

বুঝতে পেরেছিলাম যে, এ বিয়ের ফল ভাল হবে না। তাই হোলো। বৌটা এমন সেয়ানা যে, কেশব কাকাকে তিন দিনে বশ করে নিল। তার পর আমরা ত জানি, কেশব কাকার হাতে নগদ টাকা অনেক ছিল; বৌটা ধীরে ধীরে সে সব হাত করে নিল। তারপর, দু'বছর যেতে-না-যেতেই কেশব কাকা মরে গেলেন। রসিক ত সবই জানে। সে যখন নগদ টাকার খোঁজ করল, তখন বৌটা বলল, সে তার কিছুই জানে না। তার হাতে কেশব কাকা একটী পয়সাও দিয়ে যান নি। শোন দেখি কথা! এতে রসিক চুপ করে থাক্‌বে কেন? আজ তিনমাস ধরে এই নিয়ে গোল চল্‌ছে। গাঁয়ের লোকে কত চেষ্টা করেছে, কিছুতেই বৌটা নরম হোলো না। কাজেই এখন রসিককে পথ দেখ্‌তে হবে; মামলা আরম্ভ হবে। আচ্ছা, বল দেখি, তুই বৌ মানুষ; একটা ছেলে কি মেয়েও নেই যে, তাদের জন্য টাকাকড়ি সরিয়ে রাখবি। আর তুই ত জানিস পরেশ, রসিক অতি ভাল ছেলে। সে যে তার বিমাতার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করেছে বা ভবিষ্যতে করবে, এ আমাদের মোটেই মনে হয় না। তাই বুঝি রসিক আজ তোকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল?"

বাবা বল্‌লেন, "হাঁ দিদি, সেই জন্যই গিয়েছিলাম। কিন্তু যা বুঝলাম তাতে কেশব কাকার স্ত্রীকে কিছুতেই নরম করা যাবে না। এখন কাজেকাজেই সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ করে রসিককে নালিশই করতে হবে। তবে আমি বলে এসেছি যে, আমি এ গোলমালের মধ্যে যাব না। গাঁয়ের লোকের বিবাদ-বিসংবাদ যদি মিটিয়ে দিতে পারি, সে ভাল কথা; কিন্তু মামলা মোকদ্দমার পরামর্শের মধ্যে আমি নেই, কি বল দিদি?"

পিসিমা বল্‌লেন, "সে অতি ঠিক কথা। তুই ত জবাব দিয়ে এসেছিস্। আরে, এ সব যে হবে, সে ত জানা কথা। দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে অনেককেই এ গোলে পড়তে হয়। হাঁ, যদি দেখ্‌তাম যে কেশব কাকার ছেলেপিলে নেই, তা হলে বিয়েতে আমরাও আপত্তি করতাম না। অবস্থা ভাল; না হয় বিয়ে করলি। কিন্তু তাও বলি পরেশ, আবার বিয়ে না করলে কি চলে না? কি জানি, আমার কিন্তু এসব মোটেই ভাল লাগে না। এই সেদিন আমাদের গাঁয়ে মুখুয্যেদের বাড়ী একটা সভা হয়েছিল; কল্‌কাতা থেকে একজন বাবু বক্তৃতা করতে এসেছিলেন। আমরাও তাঁর

বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। তিনি ভারি সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মেয়ে আর পুরুষকে সমান অধিকার দিতে হবে। মেয়ে বিধবা হলে তার আবার বিয়ে দেওয়া যেমন আমাদের হিন্দুধর্ম্মে নিষেধ আছে, তেমনই পুরুষেরও এক স্ত্রী মারা গেলে আবার বিবাহ করা নিষেধ হওয়া উচিত। যেটা একের পক্ষে গর্হিত, সেটা অপরের পক্ষেও গর্হিত হওয়া উচিত। স্ত্রীলোকেরই সতীত্ব, আর পুরুষের বুঝি কিছুই নয়? কথাটা এক হিসাবে কিন্তু খুব পাকা কথা। কি বলিস্ পরেশ?"

বাবা বল্‌লেন, "আমি উকিল মানুষ, মক্কেল ঠকিয়ে খাই ; ও সব বড় বড় কথা কোন দিন ভাবিও নেই, ভাবতেও যেন না হয়। তবে এই কথা বল্‌তে পারি দিদি, পুরুষের কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করা উচিত নয়। ঐ যে এক কথা, ছেলে নেই, বংশ রক্ষা হবে না ; ওটা বাজে কথা। ভারি আমাদের বংশ, তার আবার রক্ষা। আমাদের মত অপদার্থদের বংশ লোপ হওয়াই ভাল।"

পিসিমা বল্‌লেন, "আমি অতদূর যেতে চাই নে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, পিণ্ডদানের জন্যই মানুষ পুত্র কামনা

করে ; বাপ পিতামহের সদ্গতির জন্ম বিবাহের দরকার আছে ; কিন্তু, ছেলে যার আছে, সে কেন আবার বিবাহ করতে যাবে। সেইটেই অন্যায় ব'লে আমার মনে হয়।"

বাবা বল্‌লেন, "সে ত ঠিক কথাই। আমি তার থেকেও আরও একটু বেশী বল্‌তে চাই।"

এই আলোচনা হয় ত আরও অগ্রসর হইত, কিন্তু এই সময় রামচরণ জ্যেঠা আসিয়া বলিল, "দিদি, জামালপুরের বরদা বিশ্বাস এসেছে। তার অবস্থা বড়ই খারাপ হয়েছে। তার যে তেইশ টাকা খাজনা বাকী আছে, সে সেইটা মাপ চায়। আমি তাকে বল্‌লাম, এখন এই শোকের সময় তুমি যাও, আর একদিন এসো। সে কিছুতেই শুন্‌বে না।"

পিসিমা বলিলেন, "তাকে ডেকে নিয়ে এস। স্বয়ং মালিক উপস্থিত আছেন, তিনিই যা হয় হুকুম দেবেন। কি বলিস্ সুরেশ ?"

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। এ কথার আবার কি উত্তর দেব। রামচরণ জ্যেঠা বাহিরে চলিয়া গেল, এবং একটু পরেই সেই লোকটীকে নিয়ে এল।

তার অবস্থার কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন, "বিশ্বাসের

পো, তোমার কথা ত শুন্‌লাম। দেশের গরীব লোক সবারই অবস্থা তোমারই মত; কেউ-ই সুখে নেই। কিন্তু ভেবে দেখ; তোমরা সবাই যদি দুরবস্থার কথা জানিয়ে খাজনা মাপ চাও, তা হ'লে আমরা রাজার প্রাপ্যই বা কোথা থেকে দেব, আর নিজেরাই বা কি করব।"

সে লোকটা বলিল, "বাবু, আপনি যা বল্‌লেন, সে সবই ন্যায্য কথা; কিন্তু, আমাদের মত গরিবের দিকে যদি আপনারা না দৃষ্টি করেন, তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথা? এই জিজ্ঞাসা করুন না রামচরণদাকে, আর দিদি ঠাকরুণই কি জানেন না, এতগুলো ছেলেপিলে নিয়ে কি কষ্টে আছি। আগে কখন কোনদিন খাজনা মাপের জন্য আসিনি। এবার বড়ই অজন্মা; কি খাব, তারই উপায় পাচ্ছি নে; কাজেই আপনাদের কাছে এসেছি।"

বাবা তখন পিসিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দিদি, কি বল?"

পিসিমা রামচরণ জ্যেঠার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি কি বল?"

রামচরণ জ্যেঠা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা

হ'লে আমার উপরই হুকুমের ভার তোমরা দিচ্ছ। বেশ, আমিই হুকুম দিচ্ছি। আমি কা'লই সব প্রজাকে খবর দেব যে, আমার সতীলক্ষ্মী বৌমার নামে আমরা এ বৎসর সকল প্রজার খাজনা মাপ দিলাম। এই আমার হুকুম।"

এই কথা শুনিয়া বাবার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল ; তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া রামচরণ জ্যেঠাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি দাদার মতই কথা বলেছ। এমন কথা তোমার মত দেবতার মুখেই সাজে। তোমার হুকুমই বহাল থাক্‌বে।"

আমি রামচরণ জ্যেঠার মুখের দিকে চাহিলাম। সে মুখে যে শোভা সেদিন দেখিয়াছিলাম, এতকাল চলিয়া গিয়াছে, এখনও তাহা ভুলিতে পারি নাই।

(পরেশের কথা)

১৩

বিনা কাজকর্ম্মে বাড়ীতে চুপ ক'রে ব'সে থাকা আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর হ'য়ে উঠেছিল ; আবার ছেলে-মেয়েদের ছেড়ে ত কখনও থাকি নাই ; তাদের এই পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে ম্যালেরিয়ার মধ্যে রেখেই বা কলিকাতায় যাই কি করে ? তার পর কলিকাতায় গিয়েই কি কাজ-কর্ম্ম মন দিয়ে করতে পারব ? কলিকাতার বাড়ীতে, যেখানে এতদিন সুখে কাটিয়েছি, সেখানে—সেই নির্জ্জন পুরীতে ত আমি একদিনও তিষ্ঠিতে পারব না। দিন-রাত সুধু এই সব কথা

ভাবি। দিদি কত বলেন, রামচরণ-দা কত উপদেশ দেয়, হেসে খেলে বেড়াতে বলে, বিষয়-কর্ম্ম দেখ্‌তে বলে ; আমার সে সব কিছুই যে ভাল লাগে না !

কিন্তু, এমন করে বসেই বা কত দিন থাকি। এতকাল ওকালতি ক'রে দু'লাখ পাঁচ-লাখ জমাতে পারি নাই ; তবে, একেবারে যে নিঃসম্বল, তাও বল্‌তে পারিনে। কলিকাতায় ভবানীপুরে একখানা বাড়ীও করেছি ; কোম্পানীর কাগজও কিছু আছে ; ব্যাঙ্কেও যৎকিঞ্চিৎ আছে ; বাড়ীতে যা জমাজমি আছে, তাতে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান হ'তে পারে। কিন্তু, আজকালকার দিনে, এই যা আছে, তার উপর নির্ভর ক'রে বিশ্রাম করা কিছুতেই হ'তে পারে না। দুটী ছেলে আছে ; তাদের লেখাপড়া শিখাতে হবে, মেয়েটির বিয়ে দিতে হবে। সুতরাং একেবারে চুপচাপ ব'সে থাকা কোন রকমেই সঙ্গত নয়।

সবই বুঝতে পারছি ; কিন্তু, কলিকাতায় যাবার কথা মনে হলেই আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। একবার মনে হয়েছিল, কোন জেলা-কোর্টে গিয়া ওকালতি করব ; কিন্তু পরক্ষণেই সে কল্পনা ত্যাগ করতে হয়েছে। জেলা-কোর্ট

আমার পোষাবে না ; অথচ, কি যে আমার পোষাবে, তাও ভেবে স্থির করতে পারিনে।

এমন সময় একদিন সংবাদ পেলাম যে, পাটনা হাইকোর্টে আমার এক মক্কেলের মামলার আপীলের বিচার শীঘ্রই আরম্ভ হবে। আমার এই মক্কেলের কাজ করবার জন্য আমাকে পূর্ব্ব বৎসর প্রায় তিন মাস বাঁকিপুর থাক্‌তে হয়েছিল। জেলা-জজের আদালতে আমিই মোকদ্দমা জিতে-ছিলাম। অপর পক্ষ হাইকোর্টে আপীল করেছিল। সেই আপীলের মামলার শুনানি শীঘ্রই আরম্ভ হবে ; মক্কেল মহাশয় আমাকে বাঁকিপুর যেতে অনুরোধ করে পত্র লিখেছেন।

দিদিকে এই কথা বল্‌তে তিনি বল্‌লেন, "না, না, এখন কি তোর মাথার ঠিক আছে। তুই এখন মন দিয়ে কি কাজ করতে পারবি ? কেন বেচারীর মামলাটা নষ্ট করবি। তাদের লিখে দে, যে, তুই যেতে পারবিনে।"

দিদির কথা-মত আমার মক্কেলকে আমার বর্ত্তমান মনের অবস্থা জানিয়ে, অন্য ভাল উকিল নিযুক্ত করবার জন্য পত্র লিখে দিলাম।

দিন আষ্টেক পরেই দেখি আমার সেই ধনী মাড়োয়ারী মক্কেল একেবারে আমার বাড়ীতে এসে হাজির। আমাকে যেতেই হবে। আমি তাঁর মোকদ্দমার হাল আগাগোড়া জানি; আমার জন্যই নিম্ন আদালতে তিনি জিতেছেন। আমাকে হাইকোর্টে দাঁড়াতেই হবে। সেবার তিনি আমাকে প্রতিদিন তিনশত টাকা দিতেন, এবার পাঁচশত টাকা এবং অন্য সমস্ত খরচ দিতে স্বীকার করলেন, এবং মামলা জিতলে পুরস্কার ত আছেই।

আমি হিসাব করে দেখ্‌লাম যে, এই মোকদ্দমা হাইকোর্টে অন্ততঃ দেড়মাস চল্‌বে। এতগুলি টাকা হাতছাড়া করা সঙ্গত মনে হোলো না। আরও এক কথা; এ মোকদ্দমার জন্য আমাকে আর বেশী খাট্‌তে হবে না; যা খাটুনী তা নিম্ন আদালতেই হয়ে গিয়েছে।

দিদিকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌লাম। তিনি দেখ্‌লেন এতগুলো টাকা পাওয়া যাবে; আর কল্‌কাতায় যেতে হবে না। তাই তিনি সম্মত হলেন। সুরেশকে আপাততঃ গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়াই স্থির হোলো। এখন সে এখানেই পড়াশুনা করুক, তার পর যা হয় করা যাবে। সুরেশ আর

পরশ-পাথর

মণিকে বাড়ীতে পড়াবার জন্য আমাদের গ্রামের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষককে নিযুক্ত করা হোলো।

তারপর একটা ভাল দিন দেখে বাঁকিপুর যাত্রা করলাম। কলিকাতা হয়ে না গেলে চল্‌ল না; সেখানে কাগজপত্র ছিল; সঙ্গে কিছু আইনের বইও নিতে হবে।

কলিকাতায় প্রাতঃকালে পৌঁছিলাম; সারা দিনের মধ্যেই তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে ফেললাম। রাত্রি সাড়ে আটটার পাঞ্জাব মেলেই বাঁকিপুর যাত্রা করলাম।

১৩

পূর্ব্ববারে যখন বাঁকিপুরে গিয়েছিলাম, তখন একটা বাসা ভাড়া করা হয়েছিল; সেইখানেই ছিলাম। এবার সে সকল হাঙ্গাম করতে মন সরল না। কত দিনই বা থাক্‌ব, তার জন্যে আবার একটা গৃহস্থালীর ব্যবস্থা। বিশেষতঃ, পৃথক্‌ একটা বাসা করলে সেখানে অনেক সময়ই একেলা থাক্‌তে হবে; আমি তা থাক্‌তে পারব না। একেলা হ'লেই রাজ্যের যত ভাবনা, বিগত জীবনের সমস্ত সুখের স্মৃতি আমাকে একেবারে অধীর করে ফেলে। তাই, পাটনা হাইকোর্টের উকিল শ্রীমান্‌ অরুণপ্রকাশ ঘোষকে পত্র লিখেছিলাম যে, এবার গিয়ে আমি তার অতিথি হব। আমার পত্র পেয়ে অরুণ তখনই আমাকে তার করে যে, এর চাইতে সৌভাগ্য তার আর হতে পারে না।

এইখানে অরুণের একটু পরিচয় দিই। অরুণদের বাড়ী কলিকাতায়। ওর বড় ভাই ইন্দুপ্রকাশ প্রেসিডেন্সি কলেজে আগাগোড়া আমার সহপাঠী ছিল। তার পর বি-এল্ পাশ করে আমরা দুই জনই একসঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে আরম্ভ করি। সহপাঠী অবস্থা হইতেই ইন্দুর সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠতা হয়, ক্রমে তাহা সুধু বন্ধুত্বে নয়, ভ্রাতৃত্বে পরিণত হয়। কলেজে পড়বার সময় যেমন তাদের বাড়ীতে আমার যাতায়াত ছিল, এখনও ঠিক তেমনই আছে; অবকাশ পেলেই হয় ইন্দু আমার বাড়ীতে আসে, আর না-হয় আমি তার বাড়ীতে যাই। অরুণ আমার সেই আবাল্য বন্ধু, সখা ইন্দুর ছোট ভাই। অরুণ বছর চার পূর্ব্বে যখন বি-এল্ পাশ করল, তখন তাকে আলিপুরে বা হাইকোর্টে না যেতে দিয়ে পাটনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাটনায় গিয়েই সে সেখানকার প্রধান উকিল, এবং বাঙ্গালীদলের নেতা পূর্ণেন্দু বাবুর অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হয়; নইলে এই চার বৎসরের মধ্যেই সে এমন পশার করতে পারত না। চার বছরের জুনিয়ার উকিলে যা উপার্জ্জন ক'রে থাকে, অরুণের উপার্জ্জন তার থেকে অনেক বেশী। সে বাঁকিপুরে সপরিবারেই থাকে,—পরিবার অর্থে তার স্ত্রী;

এখনও ছেলেপিলে হয় নাই। সুতরাং অরুণের বাসায় আমি বেশ থাক্‌তে পারব। তার পর, তারও এমন প্র্যাকটিস্ জমে নাই যে, তার অবকাশ নেই। তার সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় আমার বেশ কেটে যাবে। এই সব কথা ভেবেই আমি তার বাসায় থাকা স্থির করেছিলাম।

ভোর বেলায় বাঁকিপুর ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি, অরুণ হাজির। বাঁকিপুর আমার অপরিচিত স্থান নয়; অরুণের বাসাও খুঁজে নিতে হবে না; এ সব জেনেও সে অত সকালে কেন ষ্টেশনে এসেছে, এর জন্যে তাকে অনুযোগ করলাম। সে বল্‌ল, "দাদা, অন্য সময় হোলে আমি ষ্টেশনে আস্‌তাম না; আপনার বাড়ীতে আপনি আস্‌বেন, আমি অভ্যর্থনা করতে ষ্টেশনে আস্‌ব কেন? কিন্তু, এবার আপনার যে মনের অবস্থা, তাতে দাদারই উচিত ছিল আপনাকে এখানে রেখে যাওয়া। তা না ক'রে তিনি আমাকে টেলিগ্রাম করলেন আমি যেন ষ্টেশনে হাজির থাকি। তাই আমি এসেছি। মহামান্য অতিথি বলে অভ্যর্থনা করতে আসিনি।"

আমি হেসে বল্‌লাম, "আরে, তুই ত দেখ্‌ছি এই অল্প দিনের মধ্যেই বেশ বক্তার হয়ে পড়েছিস্। তা বেশ, তুই যে

এমন হবি, তা কিন্তু আমরা কোন দিনই মনে করিনি। কল্‌কাতায় কলেজে পড়বার সময় তুই যে নিতান্তই গো-বেচারী ছিলি। ওকালতীতে যে তোর কিছু হবে না, সেই ত আমরা স্থিরই করেছিলাম ; আর সেই জন্যই তোকে একেবারে বেহারে নির্ব্বাসন করেছিলাম। এখন দেখ্‌ছি, আমাদেরই ভুল হয়েছিল। এখন চল্, বাসায় যাই। রেলে আমার কিছুতেই ঘুম হয় না ; এখন বাসায় গিয়ে একটু শুয়ে শরীরটা তাজা করে নিতে হবে। কা'লই মোকদ্দমা উঠ্‌বে ; সন্ধ্যার পরই মক্কেল সব এসে জ্বালাতন করবে।"

অরুণকে নিয়ে বাসায় এসে দেখি সে সত্যসত্যই আমার অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন করে রেখেছিল। বাসায় উঠ্‌তেই অরুণ বল্‌ল, "দাদা, এই পাশের ঘরটা আপনার জন্য গুছিয়ে রেখেছি।"

আমি বল্‌লাম, "কেন, বল্ দেখি ; তোর এ ঘরে কি হাইকোর্টের উকিল পরেশনাথ মিত্রের বস্‌বার স্থান হ'তে পারে না ? তাতে কি তার সম্মানের হানি হয় ; হ্যাঁ রে অরুণ, এ সব ফরম্যালিটি তোকে কে শিখিয়েছে।"

অরুণ বল্‌ল, "দোহাই দাদা, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

ছেলেবেলা থেকে দেখে-দেখেও কি আমি আপনাকে চিন্‌তে পারিনি। আপনার চালচলন কি আমি জানিনে। কিন্তু, এ বাড়ীতে আমার হুকুম চলে না দাদা !"

আমি বল্‌লাম, "ও বুঝেছি, রাজেন্দ্র বাবুর মেয়ে এখন বাড়ীর গিন্নী হয়ে বসেছে। কিন্তু, সেও ত আমাকে বেশ জানে ; আমার বাড়ীতেও কতবার গিয়েছে ; আমার চালচলন কি তারও নজরে পড়ে নাই।"

অরুণ বল্‌ল, "দাদা, তারও অপরাধ নেই।"

"তবে এ সব বন্দোবস্ত কি ও-পাড়ার কেউ এসে জোর করে করেছে।"

অরুণ বল্‌ল, "ঠিক ও-পাড়ার কেউ নয় দাদা, বাড়ীতেই আর একটী উপসর্গ এসে জুটেছেন ; এ সব তাঁরই ব্যবস্থা।"

"এমন উপসর্গ কে রে অরুণ ?"

"তিনি হচ্ছেন, আপনার বৌ-মার কনিষ্ঠা ভগিনী কুমারী অণিমা ; তিনি এইবার বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে কয়েক দিন বিশ্রাম করবার জন্য এই গরীবখানায় এসে-ছেন ; এ সব তাঁরই ব্যবস্থা।"

"তারপর।"

অরুণ বল্‌ল, "আগে কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাতেমুখে জল দিয়ে বসুন, তখন অত সব পরিচয় দেওয়া যাবে।"

আমি কি করি; আমার জন্য যে ঘরটী সাজানো হয়েছিল, তাতে প্রবেশ করে দেখলাম যে, বিলাতী ধরণে একটা বসবাস ঘর যেমন করে সাজাতে হয়, তার কিছুমাত্র ত্রুটী নেই। সে সকলের বর্ণনা আমি ঠিক ঠিক দিতে পারব না। কলকাতায় বহুদিন আছি; অনেক বড়মানুষের ড্রয়িং-রুমেও গিয়েছি; অনেক আস্‌বাবপত্রও দেখেছি; কিন্তু, স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আমি তার অনেক জিনিসের নামও জানিনে। আমার বাড়ীতে ও-সব বিলাতী জঞ্জালও নেই, অত উনকুটি-চৌষট্টি বিলাস-উপকরণও নেই। যা নইলে ওকালতীর ঠাট বজায় থাকে না, সেই রকম খানকয়েক চেয়ার টেবিল বেঞ্চ আলমারী আছে, আর আছে সেই সনাতন ফরাস। বাইরেও যেমন, আমার অন্দরেও তাই ছিল। সুতরাং অরুণের এই ড্রয়িং-রুমের বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।

চারিদিকে একবার চেয়ে দেখে বল্‌লাম, "তা বেশ করেছ; দাদাকে বিলাতী ছাঁচে ঢালবার এ চেষ্টা তোমাদের একেবারেই ব্যর্থ হে অরুণ! তারপর, এটা ত হোলো ড্রয়িং-

রুম ; বেড-রুমটা আবার কেমন, তাও এই সঙ্গেই দেখে নিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসি, কি বল ?"

অরুণ পাশের ঘরের পরদাটা সরিয়ে ধরে বল্‌ল, "এইটে আপনার শোবার ঘর।"

সে ঘরটাতেও প্রবেশ করে দেখলাম, হাঁ বটে, আজকালকার নব্য-সভ্যতার যা যা উপকরণ, সে সকলই সমাহৃত হয়েছে। আমি তখন বাহিরের বারান্দায় গিয়ে একখানি চেয়ারে ব'সে কাপড়-চোপড় খুলে ফেললাম। আমার সঙ্গে যে চাকরটা এসেছিল, সে সে-সব গুছিয়ে রাখতে গেল। তারপর, হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখি, একেবারে চায়ের সরঞ্জাম গোছানো রয়েছে—মায় রুটি মাখন পর্য্যন্ত। এক পাশে একখানি ডিসে গুটি দুই তিন হাভেনা চুরুট, আর একবাক্স সিগারেট ও দিয়াসলাই সাজানো আছে।

আমি অরুণের দিকে চেয়ে বল্‌লাম, "হ্যাঁ হে অরুণ, আর কারও আস্‌বার কথা আছে না কি ?"

অরুণ বল্‌ল, "কেন, বলুন দেখি ? না, আজ রবিবার হোলেও কারও ত এখানে আস্‌বার কথা নেই।"

"তবে এ সব কার জন্য ?"

"আপনার জন্যই চা ঠিক করা হয়েছে, সব আর কৈ ?"

আমি বল্‌লাম, "ভাল, ভাল, এই চার বছরের মধ্যে তুই যে এমন করে আমাকে ভুলে যাবি, তা আমি ভাবিনি। এই সেবারও ত আমাকে এখানে দেখেছিস্, তার আগে এই ষোল সতের বছরে তোদের বাড়ীতেও আমাকে দেখেছিস্; আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি ষ্টুপিড্, আমাকে কখনও চা খেতে দেখেছিস্, আমার মুখে কখন পান চুরুট সিগারেট দেখেছিস্ ?"

অরুণ বল্‌ল, "আমি সে কথা বলেছিলাম, আপনার বৌ-মাও বলেছিলেন; কিন্তু আমার শ্যালিকা মহাশয়া সে কথা আমোলেই নিলেন না। তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন; বল্‌লেন, 'আমার সঙ্গে পরেশ বাবুর পরিচয়ই না থাক, আমি তাঁকে চিনি। অতবড় হাইকোর্টের উকিল, অমন বিদ্বান্, অমন সুলেখক চা খান না, কি চুরুট সিগারেট ব্যবহার করেন না, এ আমি চক্ষে দেখ্‌লেও বিশ্বাস করিনে। কোন মাননীয় বাড়ীতে এলে তাঁর জন্য কি কি করতে হয়, তার হিসেব আমার আছে; সে সব আমাকে বলে দিতে হবে না। অত বড় লোকটা আস্‌ছেন, তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করতে হয়।' আমি কি করব দাদা, তাঁর হুকুমই যথাসাধ্য পালিত হয়েছে।"

আমি বললাম, "হাঁ, এখন বুঝতে পেরেছি ; রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে সব বিলাতী কায়দা ; তারই ঢেউ এসে তোরও গায়ে লেগেছে, কেমন ?"

অরুণ বলল, "না দাদা, আপনার বৌ-মা আপনাদের কাছে এসে সে সব আদব কায়দা প্রায় ভুলে গেছেন ; তাঁর এ-সব খুটিনাটি নেই। কিন্তু তাঁর ছোট বোনটীর জন্য এখনও যে শিকল তৈরী হয় নি ; তারপর তিনি এবার বেথুন কলেজ ফেরত। একটু সবুর করুন না ; তিনি বোধ হয় আপনার ব্রেকফাষ্টের ব্যবস্থায় ব্যস্ত আছেন, তাই আসতে পারছেন না। আপনি আসছেন শুনে, তার কি আনন্দ, কি উৎসাহ! বলে 'যাক্, এই ছাতুর মধ্যে দিন-কয়েক একটু মধু মিলবে।' তার সেই সব বিদ্ঘুটে জার্ম্মেণী, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কের দাঁতভাঙ্গা-নামধারী অথরদের আলোচনা আমি কি ধৈর্য্য ধরে শুনতে পারি। তিনি আমার কাছে নভেলিষ্টদের আর্ট, কাল্চার, রিয়ালিজম্, আইডিয়া-লিজম্ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে তেমন সুবিধা পান না। আমি ও-রসে বঞ্চিত ; না বুঝি আর্ট, না বুঝি কবিতা। কাজেই তাঁর অবস্থা ভারি সঙ্গীন হয়েছিল। আমার কাছে এ সব

কথা তুল্‌লেই আমি তাঁর হাতে একেবারে স্পেসিফিক্ রিলীফ্ এ্যাক্টখানি দিয়ে বলি, দেখ গো, এর মধ্যে যা আছে, তা তোমার রবীন্দ্রনাথ মাথা খুঁড়েও বল্‌তে পারবেন না। এখন আপনি এসেছেন, তিনি বাঁচবেন। আপনার মত সমজদার পাবেন বলে তাঁর কত উল্লাস, কত আনন্দ!"

আমি বল্‌লাম, "হোলো ভাল; এসেছি যমুনাদাস বাবুর আপীলের মামলা করতে, আইন নজীর দেখাতে, বক্তৃতা করে মামলা জিতে নিতে, তারপর যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পকেটে পূরে দেশে ফিরে যেতে; কিন্তু এর মধ্যে ত কবিতার বা নভেলের কোন লোকাস্ ষ্টেণ্ডাই নেই; অন্ততঃ আইন-শাস্ত্রে তা লেখে না। তাই ত, তুই যে দেখ্‌ছি আমাকে মহা বিভীষিকার মধ্যে ফেল্‌লি অরুণ। তাই ত—"

আমার কথা সমাপ্ত না হইতেই অতি সন্তর্পণে অরুণের ভৃত্য বা পাচক মহাদেও এবং তৎপশ্চাতে অরুণের স্ত্রীর কনিষ্ঠা সহোদরা কুমারী অণিমার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ।

১৭

অরুণের কাছে যে বর্ণনা শুনেছিলাম, তাতে আমি মনে করেছিলাম, সদ্য বেথুন-ফেরত একটা আস্ত বাঘের মত গ্রাজুয়েট মেয়ে এসে একেবারে দুই হাত কোন রকমে কপালের কাছ-বরাবর নিয়ে একটা তথা-কথিত নমস্কারের অভিনয় করে, একেবারে চোখে-মুখে কথা আরম্ভ করবে; কোন রকম সঙ্কোচ বা দ্বিধার ভাব তার ত্রিসীমাতেও থাকবে না। আমি মনে করেছিলাম, আলুলায়িত-কুন্তলা, আজকালকার ফ্যাসানে সাড়ীপরা, সেমিজ-জ্যাকেট-পরিহিতা, সেফ্‌টি-পিন-কণ্টকিতা, দিল্লীর সোনালী কাজকরা লপেটায় পদদ্বয়-শোভিতা এক বিংশ-শতাব্দীর মূর্ত্তিমতী-দেবীর আবির্ভাব হবে। কিন্তু, অণিমা যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল, তখন তাঁকে দেখে আমার কল্পনা একেবারে আকাশে লয় পেয়ে গেল। যা মনে করেছিলাম,

তার ত কিছুই দেখ্‌লাম না। দেখ্‌লাম, একটী লজ্জাবতী হিন্দু-কুমারী আমার কাছে এসে হাঁটু পেতে বসে আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিল। তার পায়ে জুতা নেই ; তার বদলে একটু আল্‌তার রংয়ের অবশিষ্ট তখনও পায়ে লেগে থেকে কুমারীর পদদ্বয়কে দেবীপদে উন্নীত করেছে। তার পরণে একখানি লাল-পেড়ে সাড়ী, তাও আবার আমাদের পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের মত সেই সেকেলে ধরণে পরা ; একটা সাদা সেমিজ গায়ে আছে ; মাথার চুলও আলুলায়িতা নয়, ফিতে দিয়ে আটকানও নয়, হাতে-বাঁধা একটা অমনি চলনসই খোঁপা। আমি কিন্তু এ মূর্ত্তি মোটেই প্রত্যাশা করিনি ; তাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করতেও ভুলে গেলাম।

অণিমা যখন অতি ধীরে বল্‌ল "চা ত খেলেন না, একটু জলযোগ করুন" তখন আমার চমক ভাঙ্গল ; আমি একটু ত্রুটী স্বীকারের ভাবে বল্‌লাম "আশীর্ব্বাদ করতে ভুলে গিয়েছি, কিছু মনে করো না। তুমি ছোট বৌ-মার ছোট বোন, বিশেষ বয়সেও অনেক ছোট, তাই সম্মান রক্ষা না করে একেবারে 'তুমি' বলে ফেললাম।"

আজকালকার মেয়ে এ কথার একটা উত্তর নিশ্চয়ই

দিত ; কিন্তু, এ মেয়েটা দেখ্‌লাম সে ধরণেরই নয়, অথচ অরুণ এই একটু আগেই আমাকে যে ভয় দেখিয়েছিল, তাতে আমি নিজেকে বিপন্নই মনে করেছিলাম।

আমার জন্য যে জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল, আমি তাতে মোটেই অভ্যস্ত নই। অণিমাকে সে কথা না ব'লে অরুণকে বল্‌লাম, "ওহে অরুণ, সকাল বেলা এ রকম প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা হলে আজই আমাকে পালাতে হবে। আমি সকালে কি খাই জান? একটু আদা আর একটু জল। এই আদাজল খেয়েই মক্কেলের কাজে লেগে যাই, বুঝলে।"

এইবার অণিমা কথা বল্‌ল, "এ সব ত জানা ছিল না, তাই মোটামুটি যা করতে হয় তাই করা হয়েছে। তা হলে, আদাই নিয়ে আসি।"

আমি বল্‌লাম, "না, তার দরকার হবে না ; আজ নিয়ম--ভঙ্গই ব্যবস্থা। আর বল্‌তে কি, খাবারগুলো দেখে আমার লোভও হয়েছে অরুণ। তোমার এই খোট্টা মহারাজকে ত বেশ শিখিয়ে নিয়েছে দেখ্‌ছি।"

অরুণ বল্‌ল, "রাম কহ! মহারাজের সাধ্যও নেই যে, এ সব তৈরী করে ; তার গুণ আহারের সময়েই প্রকাশ পাবে।

আর জানেন দাদা, আপনার বৌ-মা যে মোটেই জানেন না, তা নয়, মোটামুটি জলখাবার কি ব্যঞ্জন পোলাও এই সব পারেন; তার বেশী বিদ্যা তাঁরও নেই। এই যে সব দেখ্ছেন, এ সকলই আমার এই কুটুম্বিনী করেছেন।"

আমি বল্লাম "তুমি বল কি হে অরুণ! আমার এত কালের সব সংস্কার যে তুমি একেবারে চূরমার করে দিলে। বেথুনের ফেরত কুমারী, আর মাসখানেকের মধ্যেই যিনি গ্রাজুয়েট হবেন, তারপর হয় ত এম-এ কি বি-এল্ হবেন; তারপর চাই কি হাইকোর্টে আমার বিপক্ষে গিয়ে দাঁড়াবেন, আর আমি সসম্ভ্রমে বল্ব 'মাই লারনেড ফ্রেণ্ড',—তিনি কি না এই সব খাবার তৈরী করেছেন! আমি এত কাল তা হলে একটা মহা ভ্রম করে এসেছি। জান্লে অরুণ, এই উচ্চ-শিক্ষিতা মেয়েরা যে গৃহস্থালীর কেউ নয়, এই আমার বিশ্বাস ছিল। আমি তাঁদের অসম্মান করি না; তবে মনে হয় এই সব মেয়ের শিক্ষা যেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা হচ্চে না; আর সে জন্য এই সব মেয়ের অপেক্ষা আমরাই বেশী অপরাধী। যাক্ সে কথা, আমি এই জলখাবারগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আমার ভ্রান্ত ধারণার সমাধি করছি! তুমি কিছু মনে কোরো

না অণিমা, আমি যে সব পাশকরা মেয়ের সংসর্গে এতদিন এসেছি, তাঁদের দেখেই আমার এই ধারণা হয়েছিল।" এই বলেই আমি সেই সব উৎকৃষ্ট জলখাবারে মনোনিবেশ করলাম।

"বাঃ, এ কচুরী যে একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস হয়েছে" বল্‌তেই অণিমা বল্‌ল, "আর দুখানা এনে দেব ?"

আমি হো হো করে হেসে বল্‌লাম, "অরুণ, দেখ্‌লে, হাজার বি-এ, এম-এ হ'লেও আসল মানুষ ঠিক থাকে। দেখনি, মেয়েরা কিছু রান্না করলে, যদি তুমি কোনটার প্রশংসা করলে, অমনি সেটা থালাশুদ্ধ তোমার পাতে হাজির। তোমার অণিমাও সেটুকু কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। না, না, আর আমি খেতে পারব না, 'অধিক অমৃত খাইলে পীড়া হয়' বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ে পড়নি। অরুণ, আজ তিন চার মাস আমার যে কি ভাবে গেছে, সে খবর তুমি নিশ্চয়ই ইন্দুর কাছে পেয়েছ। দিন আর কাটত না ভাই! আজ অনেক দিন পরে তোমাদের পেয়ে আমি যেন একটু সজীবতা অনুভব করছি; একটা প্রফুল্লতার হাওয়া যেন আমার গায়ে লাগ্‌ছে।"

অরুণ বল্‌ল, "তা হলেই ভাল। আপনি যখন খবর দিলেন যে, যমুনাদাসবাবুর আপীলের মামলা করতে আসছেন,

তখন আমাদের ভয়ই হয়েছিল। আপনার এখন যে রকম মনের অবস্থা, তাতে কি করে যে মামলা চালাবেন, সেই ভাবনাই প্রবল হয়েছিল। আপনার মত এত বড় নামজাদা উকিল যদি ভেঙ্গে পড়েন, তা হলে ভারি লজ্জার কথা হবে। আমরা তাই বাড়ীতে বলাবলি করিলাম, আপনার মন যাতে প্রফুল্ল হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে অণিমা এখানে এসে পড়েছে ; তার উপরই এ ভার আমরা দিয়েছি। সেও তাতে খুব রাজী হয়েছিল, কিন্তু আজ যা দেখ্‌লাম, তাতে বিশেষ ভরসা হচ্চে না। উনি যে অমন সুশীলা বালিকার মত অভিনয় করবেন, তা ত জানতাম না দাদা ! এটা ওঁর ছদ্মবেশ দাদা, বুঝলেন। দিন-রাত গল্প করে, তর্ক করে, হাসিতে পাড়া ভাসিয়ে দিয়ে, গান গেয়ে দামোদরের বান ডাকিয়ে, আর রান্নাঘরে গিয়ে আগুনের সঙ্গে লড়াই করে যিনি ফিরেছেন, তিনি যে এমন চুপ করে সুবোধের মত দাঁড়িয়ে আছেন, অল্পভাষিণী হয়েছেন, এটা ভাল বোধ হচ্চে না। বোধ হয় আপনাকে দেখে এই প্রথম দিন একটু সমীহ করছেন, কেমন, না ?"

অরুণের দিকে চেয়ে অণিমা বল্‌ল, "ওরে বাবা, উকিল

হলে বুঝি এমনি এক ঝুড়ি মিথ্যা সাজাতে হয়। আমি বলছি, আমি কলকাতার রাস্তার ফেরিওয়ালী হব, তবুও মহাশয়দের মত মিথ্যার ব্যবসা করব না।"

অরুণ বলল, "মিথ্যে কথা বলা বা বানানো বড় সহজ নয়, ও একটা প্রকাণ্ড আর্ট, ওর জন্য কাল্‌চার দরকার।"

"থাক্ বাবু, তোমার আর্ট আর কাল্‌চার, আমি দেখিগে দিদি চা'লে-ডালে মিশিয়ে কি করছে।" এই বলে অণিমা চলে গেল।

১৮

সোমবার থেকেই আপীলের মামলা আরম্ভ হোলো। আমাদের পক্ষে আমি, দুইজন বিহারী উকিল, আর অরুণ; অপর পক্ষে সবই বিহারী। জজ সাহেবের সঙ্গে স্থির হোলো যে, সপ্তাহের পাঁচদিন অপরাহ্ণ দুইটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত মামলা চল্‌বে। বাড়ীতে প্রোগ্রাম করা গেল যে, প্রাতঃকালে সাতটা থেকে নটা পর্য্যন্ত মক্কেল ও উকীলবাবুদের নিয়ে মামলা তৈরী করা হবে; তারপর তাঁরা চলে যাবেন। অরুণ যথাসময়ে কোর্টে যাবে। আমি বিশ্রাম ক'রে একটার পর কোর্টে যাব। চারটে পর্য্যন্ত বকাবকি করে সে-দিনের মত একেবারে ছুটী। অপরাহ্ণে কি রাত্রিতে ওকালতীর গন্ধ পর্য্যন্ত আমাদের গায়ে থাক্‌বে না। বিকাল থেকে রাত দশটা এগারটা পর্য্যন্ত আমরা ভ্রমণ, সাহিত্যালোচনা, সঙ্গীত ও বাজে গল্পে কাটাব। বলাবাহুল্য আমাদের এ প্রোগ্রাম অণিমাই স্থির করেছিল। বৌ-মা প্রথম দুই একদিন একটু সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন; তারপর তিনিও আমাদের এই ক্ষুদ্র মজ্‌লিশে যোগ দিলেন। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, আমাকে কোন সময়েই এরা একেলা থাকতে দেবে না স্থির করেছে।

পরশ-পাথর

প্রথম দিন অণিমা যে ভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল, এখন আর সে ভাব নেই। এখন সে সদানন্দময়ী! পড়াশুনাও তার নিতান্ত কম নয়; উপন্যাসের দিকে তার বেশী ঝোঁক থাক্‌লেও সে দর্শন-শাস্ত্রেরও চর্চ্চা করে; সংস্কৃতে তার অধিকার আমাদের চাইতে অনেক বেশী; দিশী বিলাতী কবিতারও সে একজন ভাল সমজ্‌দার; বাদ্য ও সঙ্গীত-শাস্ত্রও সে রীতিমত ওস্তাদ রেখে শিখেছে। রান্নাবান্না ও পাকা গিন্নিপণার শিক্ষা যে সে বেথুন কলেজে পায় নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে যে ও সকল অনাবশ্যক বিষয়ের স্থান নেই, তা আমার জানা ছিল। আমি অবাক্ হয়ে গেলাম যে, এমন গৃহিণীপণা এই কুড়ি বৎসর বয়সের মেয়ে কোথায় শিখেছে? তাদের বাড়ীর আচার ব্যবহার ত আমার অজানা নেই। অণিমার বাপ রাজেন্দ্রবাবু একেবারে পূরা মাত্রায় সাহেব, বাড়ীতে সব সাহেবী চাল; অণিমার মাতাঠাকুরাণী প্রথমে কিছুদিন বাঙ্গালীয়ানা রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করে শেষে হা'ল ছেড়ে দিয়েছেন। এ হেন পবিত্র সংসর্গে থেকে এ মেয়েটীর মতিগতি এমন হোলো কি করে?

এক দিন কথায় কথায় এই আলোচনাই আরম্ভ হোলো।

আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা বৌ-মা, তুমি না হয় ইন্দুদের বাড়ী এসে আমাদের ঘর-গৃহস্থালীর ব্যবস্থা শিখে নিয়েছ; কিন্তু অণিমার ত এখনও সে সুযোগ উপস্থিত হয় নাই, আর যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে ও যে এম-এ, বি-এল্‌ না হয়ে কলেজ ছাড়বে, তা বোধ না। কিন্তু, আমি অবাক্‌ হয়ে যাই যে, লেখাপড়া সম্বন্ধে অণিমা সাধারণ বি-এ পড়া ছেলেদের চাইতে অনেক উপরে; তাদের অপেক্ষা ঢের বেশী পড়াশুনা। বল্‌তে কি, আমি এখনও পড়াশুনা ত্যাগ করিনি, এখনও রোজ রাত্রে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করে থাকি; কিন্তু এই ছোট্ট মেয়েটি আমার চাইতে কত বেশী পড়েছে; আর শুধু পড়া নয়, হজম করেছে। এটা ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার কিন্তু।"

অণিমা সহাস্য মুখে বল্‌ল, "যদি বা একটু-আদটুকু পড়াশুনা করছিলাম, কিন্তু আপনি যে ভাবে আমাকে স্বর্গে তুলে দিচ্ছেন, এর পরে গর্ব্বে যে আমার পা মাটীতে পড়বে না। আপনিই দেখ্‌ছি আমার মাথাটা খেলেন।"

আমি বল্‌লাম, "সে ভয় তোমার নেই অণিমা। আমরা তোমার মত অর্থশূন্য মেয়ের মাথা খাইনে; যার ঘরে টাকা আছে, তা সে মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক, তার মাথা

আমরা খেয়ে থাকি ; নইলে আমাদের এত কোঠাবালাখানা, এত মোটর, এমন ভারি ব্যাঙ্কের খাতা কি করে হয়। তোমার মত কচি মেয়ের মাথা আমরা স্পর্শও করিনে। আর এক কথা ; যে বুঝতে পারে তার মাথা খাবার চেষ্টা হচ্চে, তার মাথা কখনও খাওয়া যায় না। আমি তোমার বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত কিছুই বলি নাই, যা তোমার প্রাপ্য তাই তোমাকে দিয়েছি ; সুতরাং তুমি আমাকে তোমার স্তাবক বলে মনে করতে পার না।"

অণিমা বল্ল, "এই ত অল্প কয়দিন আপনি এসেছেন, আর তার মধ্যেও যমুনাদাস বাবু আপনার সময়ের উপর দৈনিক পাঁচশ টাকার মত ভাগ বসিয়েছেন ; তবুও এ কয়দিনে আপনার কাছে যে কত শিখেছি, তা আর বল্‌তে পারিনে। তিন চার মাস যদি আপনার সঙ্গ পাই, তা হ'লে আর এম-এ পড়তে গিয়ে পণ্ডশ্রম করিনে। আচ্ছা, আপনার এ মামলা কতদিনে শেষ হবে ?"

আমি বল্লাম, "এই ত আঠারো দিন গেল ; বোধ হয় আরও সাত আট দিন লাগ্‌বে।"

অণিমা বল্ল, "তারপর আপনি কি কর্‌বেন ?"

আমি বললাম, "কি করব তা এখনও ভেবে উঠতে পারিনি; তবে আপাততঃ কলকাতায় থাকব না; এখান থেকে সোজা একেবারে বাড়ী চলে যাব। রোজ বাড়ীর চিঠি পাচ্ছি, তবুও আমার মন বাড়ীর দিকেই পড়ে আছে। ছেলে-মেয়েদের ছেড়ে কখনও থাকিনি। এখন যে কি করব, বিষম সমস্যায় পড়েছি। গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল নয়; ছেলে-মেয়েরা যদি ম্যালেরিয়ায় পড়ে, তা হ'লে মহা বিপদ হবে। এই ম্যালেরিয়ার ভয়েই আমার স্ত্রী দেশে যেতে চাইতেন না; ছেলেদেরও কখনও পাঠান নাই। তিনিও চলে গেলেন, আর আমাকে বাধ্য হয়ে তাঁর স্নেহের সন্তানগুলিকে সেই সেই ম্যালেরিয়ার মধ্যে রাখতে হোলো। কোন দিকেই কিছু ব্যবস্থা করতে পারছি নে। বাড়ীতে দিদি আছেন; তাঁরও বয়স হয়েছে; আর কতদিন তিনি আমাদের ঘর সংসার টানবেন, বিষয়-কর্ম্ম দেখবেন। তাঁর শরীরও ভাল নয়। এ সময় তাঁর সেবা করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যে ত্রুটী হচ্চে; মনে হচ্চে মহা অপরাধ করছি। তারপর আমার রামচরণ দাদা, সে দিদিরও বড়। তাঁর মাথায় সমস্ত বোঝা দিয়ে এতকাল নিশ্চিন্ত ছিলাম। তাঁরও শরীর অবসন্ন হয়েছে;

তাঁরও সেবার দরকার। সে সব ত হচ্চেই না; উপরন্তু তাঁদের উপর ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিতে হয়েছে। এই সব ভেবে আমার মন একেবারে অস্থির, অথচ কোন পথই দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।"

অণিমা আমার কথা শুনে বল্‌ল, "সত্যিই আপনি ভারি বিপদে পড়েছেন। আর কেউ হলে বলত যে, বাড়ীঘর বন্ধ করে ছেলেমেয়ে ও আপনার দিদিকে নিয়ে আপনি কলিকাতায় চ'লে আসুন; বিষয়-আশয় যা আছে, তার জন্য নায়েব গোমস্তা রেখে দিন। কিন্তু আপনি যদি আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন—কি, তোমরা যে বড় হাস্‌ছ—পরামর্শ দেবার স্পর্দ্ধা দেখে, না? জান না, শাস্ত্রে লেখা আছে, 'বয়সেতে বৃদ্ধ নয়, বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে'। পরেশ বাবু বড় উকীল হতে পারেন, আইনে ওঁর অসাধারণ জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু, এ কয়দিন ওঁর সঙ্গে কথা বলে, আর ওঁর ঘর-গৃহস্থালীর খবর নিয়ে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে, উনি সংসারধর্ম্মের কিছুই জানেন না। যতদিন বৌ-দিদি বেঁচে ছিলেন, তিনি কলিকাতার সংসার চালাতেন; আর বাড়ীতে ওঁর দিদি আছেন, আর অনেক দিনের ভৃত্য রামচরণ আছেন, তাঁরাই

বিষয়-আশয় দেখতেন ; উনি টাকা রোজগার করেই খালাস। সুতরাং, বয়সে ছোট হ'লেও ওঁকে উপদেশ দেবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যাক্, কি বল্‌ছিলাম। হাঁ, মনে পড়েছে, এই আপনার ব্যবস্থার কথা পরেশবাবু! আমার পরামর্শ এই যে, আপনি উপার্জ্জনের লোভটা একটু কম করুন। ওকালতী ছেড়ে দিয়ে এই বয়সে বাড়ী গিয়ে বস্‌তে কেউ আপনাকে পরামর্শ দেবে না। আপনি সপ্তাহের পাঁচদিন কল্‌কাতায় থাক্‌বেন ; শুক্রবার রাত্রেই দেশে চলে যাবেন, আবার সোমবারে আস্‌বেন। আপনার যে রকম নামডাক হয়েছে, তাতে এই কয়দিনেই আপনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পারবেন। বড়মানুষ হয়ে সবাই যদি দেশ ছেড়ে কলকাতা, ঢাকা, বাঁকিপুরে চলে আসেন, তা হলে দেশ রক্ষা করবে কে ? যারা গ্রামে থাকে, তারা গরিব, তাদের দিন-অন্ন চলে না ; তারা গ্রামের উন্নতির জন্য কি করতে পারে। সেই জন্যই বল্‌ছি, আমার পরামর্শ মত কাজ করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

অরুণ বল্‌ল, "পরামর্শটা এক-দিকের জন্য হোলো ; আরও অনেক কথা আছে যে মহাশয় !"

অণিমা বল্‌ল, "তা আমি জানি ; কিন্তু উপদেশ দেবার

অধিকার আর অনধিকারের সীমারেখাও আমার সম্মুখ থেকে মুছে যায় নাই। না, আজ ভারি 'সিরিয়স্' হওয়া গেছে। এখন একটা গান গাই, কি বলেন পরেশ বাবু!"

আমি বল্‌লাম, "আমি এ প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করছি।"

ঘন করতালির মধ্যে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল; আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচলাম, কারণ কথাবার্ত্তা অন্য দিকে বড়ই অগ্রসর হচ্ছিল।

অণিমা হারমোনিয়াম সংযোগে গান ধরিল—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।"

গান শেষ হইল; সমস্ত ঘরখানি যেন পবিত্রতায় ভরে গেল!

অরুণ বল্‌ল, "রাত যে এগারটা বাজে, আর নয়। কা'ল কোর্টে তুমুল সংগ্রাম আছে জানেন ত দাদা!"

অণিমা বল্‌ল, "দাদা তাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। মশাই জুনিয়ার কি না; এখনও বুক কেঁপে ওঠে। যান মশাই বিছানায়, শুয়ে আইন আর নজীর দেখুন গিয়ে; পরেশবাবু ততক্ষণ নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিন।"

১৯

বাঁকিপুরের মামলা শেষ করে আজ তিন দিন হোলো বাড়ীতে এসেছি। কল্‌কাতায় কয়েক ঘণ্টা ছিলাম; টাকা-গুলো ব্যাঙ্কে রেখে আর আইনের পুঁথি ও অনাবশ্যক বস্ত্রাদি বাসায় ফেলে দিয়ে, বল্‌তে গেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার পল্লী-ভবনে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। উনত্রিশ দিন ছেলেপিলেদের মুখ না দেখে আমি যেন তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে পড়েছিলাম। পূর্ব্বের বারে যখন বাঁকিপুরে যেতে হয়েছিল, তখন শুক্রবার রাত্রির মেলেই কলকাতায় চলে আসতাম, আবার রবিবার রাত্রিতে যেতাম। এবার আর কার জন্য কলকাতায় দৌড়ে আস্‌ব?

এই ত সবে তিন দিন বাড়ীতে এসেছি, এরই মধ্যে যেন কিছু ভাল লাগছে না। ছেলেদুটী আর মেয়েটীকে দেখবার জন্য যে আকুল আগ্রহ জন্মেছিল, বাড়ী এসে তাদের সুস্থ ও

প্রফুল্ল দেখে সে আগ্রহও যেন অনেকটা মিটে গেছে। ছেলেমেয়েদের জন্য যে সব আবশ্যক-অনাবশ্যক জিনিস বাঁকিপুর ও কলকাতা থেকে কিনে এনেছিলাম, তাদের ভাগ-বাঁটোয়ারা আর আলোচনা ত অল্প সময়ের মধ্যেই চুকে গেছে। দিদির স্নেহ, রামচরণ দাদার সাগ্রহ যত্ন যেন আমার সব অভাব পূরণ করতে পারছে না; ছেলেমেয়েদের হাসিমুখ আমার প্রাণে আনন্দধারা ঢেলে দিত; এখন কিন্তু তাদের দিকে চাইলে আমার সেই পুরাতন স্মৃতি মনে জেগে ওঠে।

তারপর, এবার বাঁকিপুরে গিয়ে এই মাসখানেক যে ভাবে কাটানো গিয়েছে, তার স্মৃতি আমার জীবন-যাত্রা-প্রণালীকে যেন এক-এক সময় পুরাতন পথকে ছাড়িয়ে নূতন এক পথে নিতে চায়। আমি আমার জীবন এতদিন যে ভাবে কাটিয়েছি, তার মধ্যে শোভা সৌন্দর্য্য, তার মধ্যে কোন প্রকার মাদকতা ছিল না; আমার জীবন সাধারণ গৃহস্থের জীবনের মতই বৈচিত্র্যহীন; তার মধ্যে কোন দিনই সৌন্দর্য্যের ছায়াপাত হয় নাই; তাতে কোন দিনই মলয়-হিল্লোল প্রবাহিত হয় নাই; চাঁদের জ্যোৎস্না আমার গৃহের দ্বারে আমার হৃদয়ের দ্বারে এসে মাথা কুটে-কুটে বিফল-

মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছে। কলেজে ছিলাম আমি গণ্ড মানুষ; দিনরাত পড়াশুনা নিয়ে থাকতাম; সঙ্গীও জুটেছিল ঠিক আমারই মত এই ইন্দুপ্রকাশ। আমাদের দুইজনের মিলেছিল ভাল; কোন প্রকার কবিত্বের বালাই ছিল না; যৌবন-সুলভ কোন চাঞ্চল্যই আমাদের মনে স্থান পায় নাই। আর সকলের মত নভেল নাটকও আমরা পড়েছি, থিয়েটারও দেখেছি, কিন্তু প্রেমে পড়বার কোন লক্ষণ কোন দিন আমাদের এই দুইটী ভবিষ্যৎ-হাইকোর্ট-যাত্রীকে উদ্দেশ্যচ্যুত করতে পারে নাই। পাশের পর পাশ করে গিয়েছি। মাঝে একবার বাবা চিঠি লিখে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বল্লেন, "তোর বিয়ে দেব কল্‌কাতায়, আমি মেয়ে ঠিক করে কথাবার্ত্তা পাকা করে এসেছি।" ব্যস্, তার উপর আর কথা কি? তখন একবারও মনে হয় নি, বাঃ, বিয়ে করব আমি, সুখ দুঃখ পোহাতে হবে আমাকে; আর আমাকে কিছু না বলে বাবা একেবারে পাকা করে বসেছেন। মেয়েটী কেমন, লেখাপড়া জানে কি না, কোন কথা কাউকে জিজ্ঞাসাও করলাম না। বিয়ে হয়ে গেল; তাতে যে আমার বি-এ, এম্-এ ও বি-এল্ পরীক্ষার কোন ব্যাঘাত হয় নি, ইউনিভারসিটির ক্যালেণ্ডার তল্লাস

করলে তার প্রমাণ সবাই পাবেন। তারপর আর কি,—হাইকোর্টের উকিল হলাম। এর মধ্যে কোন প্রকার রোমান্স এক দিনের জন্যও আমার জীবনের মধ্যে প্রবেশলাভ করে নাই। ওকালতী করি, পয়সা আনি, স্ত্রী ও ছেলেপিলেদের নিয়ে ঘর-সংসার করি, অবকাশ-সময়ে পড়াশুনা করি, এই সোজাসুজি আমার জীবনের কাজ ছিল।

কিন্তু,—এই 'কিন্তু' আমার এতদিন ছিল না; অতৃপ্তির ধার আমি কোন দিন ধারি নি। যা ভগবান দিয়েছেন, তাই হাসিমুখে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করেছি। তারপর যেদিন আমার সহধর্ম্মিণী আমাকে অকস্মাৎ ত্যাগ করে গেলেন, তখন চারিদিক অন্ধকার দেখেছি বটে, কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস হারাইনি। আমি বিপন্ন বোধ করেছিলাম আমার ছেলেমেয়ে তিনটীর জন্য; নিজের জন্য কোন ভাবনাই হয় নাই। তবে একটু শূন্যতা যে অনুভব করতাম, সে কথা ঠিক।

কিন্তু এবার বাঁকিপুরে গিয়ে, এই প্রৌঢ়ত্বের প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়িয়ে আমি যেন এই এক মাসে আর একটা নূতন জগতের আভাস পেয়ে এসেছি। এ জগতের সঙ্গে আমার কোন দিন সামান্য পরিচয়ও ছিল না। এ রাজ্যের মধ্যে আইনের

কেতাব নেই, দর্শনশাস্ত্রের পুঁথি নেই, গীতা ভাগবত নেই, সুতরাং আমি তার বর্ণনা কি করে দেব ?

এই যে একমাস আমি বাঁকিপুরে ছিলাম, এই সময়টা যে কোন্ দিক্ দিয়ে চ'লে গিয়েছে, তা আমি বুঝতেও পারি নাই;—একটা যেন আনন্দের বাজারে আমি প্রবেশ করেছিলাম। অণিমার গানবাজনা, তার কথাবার্ত্তা, তার জ্ঞান-চর্চ্চার প্রগাঢ়তা, তার সদানন্দময়ী মূর্ত্তি, তার স্নেহ-প্রবণতা, সরলতা আমাকে এই একমাস একেবারে যেন মরজগতের বাহিরে নিয়ে রেখেছিল। একটা উন্মাদ সৌন্দর্য্যে আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। এক-এক সময় মনে হোতো—থাক সে কথায় আর কাজ নাই। আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হব না;—তিনি যাবার সময় তাঁর সুরেশ মণি রাণীকে যে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছেন! তাঁর গচ্ছিত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণই আমার জীবনের প্রধান—শুধু প্রধান কেন, একমাত্র কর্ত্তব্য। আমি সে কর্ত্তব্যচ্যুত কিছুতেই হব না—কিছুতেই না।

২০

এক দিন সন্ধ্যার পর ছাতে মাতুর পেতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে গল্প করছিলাম ; ছোট তুটী গল্প শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, সুরেশ ঘুমায় নাই। এমন সময় হরিনামের মালা হাতে নিয়ে দিদি এসে আমাদের পাশেই একখানি আসন নিয়ে বসলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "দিদি, এমন অসময়ে যে আমাদের মজলিশে এলে।"

দিদি বললেন, "এই মালা হাতে করে মনে করলাম, একবার তোদের কাছে এসে বসি।"

আমি বললাম, "হরিনাম করা, আর আমাদের সঙ্গে গল্প করা, এ তুটো একসঙ্গে কি ক'রে হবে দিদি!"

দিদি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হরিনাম কি আর এখন করব ভাই, তোদের ভাবনাই আমার হরিনামকে ছাড়িয়ে উঠেছে, তবু যে মালা নিয়ে বসি, এটা অভ্যাস।"

আমি বললাম, "দিদি, ওতে নামাপরাধ হয়, তা জান। আর তুমি এত ভাবই বা কি, আমি ত ভেবে পাইনে।"

দিদি বল্‌লেন, "নারায়ণ করুন, তোকে যেন কিছু ভাবতে না হয়। কিন্তু, আমার যে সব গেল। কোথায় মনে করেছিলাম, আর কেন, কাশী গিয়ে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাব। বাবা বিশ্বনাথ বল্লেন, রও বেটী, তোমার কাশী দেখাচ্ছি। সতীলক্ষ্মী বৌমাটীকে অমনি সরিয়ে নিলেন, আর এই সোণার বাছাদের ভার আমার উপর দিলেন। এখন ভাবি, এদের কি করে মানুষ করব, আর তোকেই বা কোন্ পথ দেখিয়ে দেব। ছেলে দুটী যদি সাবালক হোতো, রাণী যদি শ্বশুরের ঘরে যেত, তা হ'লে বল্‌তাম, চল্ পরেশ, দুই ভাইবোনে কাশী চলে যাই। সে সব যে কিছুই হোলো না, অসময়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। তোর মত এমন ভাইকে আমি কি করে বল্‌ব যে, তুই অমন ওকালতী ছেড়ে এই পাড়াগাঁয়ে বসে জীবন কাটা। সে কি পারি? এই সে দিন জীবন কাকার ছেলে অমর বল্‌ছিল, 'দিদি, দাদাকে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দেও। তোমরা ত জান না, আর দুই এক বছরের মধ্যেই পরেশদা হাইকোর্টের জজ হবেন যে।' আরে, আমি কি তা জানিনে; কিন্তু, তুই একলা সেখানে কি করে থাক্‌বি। তুই কি কোন দিন ঘর-সংসার করেছিস।

সেখানে বৌ-মা ছিল, সব দেখ্‌ত; এখানে আমি আর রামচরণদা আছি; তোকে কি এতকাল কিছু পোহাতে হয়েছে। এক-একবার মনে করি, ছেলে দুটোকে সঙ্গে দিয়ে তোকে পাঠিয়েই দিই; কিন্তু ওদের যে অযত্ন হবে, তা আমি দেখ্‌ব কি করে। এখন বল্ ত, তুই কি করবি? আমি তোরই উপর নির্ভর করছি; যা তোর ভাল বিবেচনা হয়, তাই কর।"

সুরেশ চুপ করে এই সব কথা শুন্‌ছিল; সে বল্‌ল, "পিসিমা, আমার কথা শুন্‌বে। আমি বলি কি, বাবা কল্‌কাতায় যান, আমরা এখানে তোমার কাছেই থাকি। শনিবারে ত হাইকোর্ট বন্ধ থাকে। বাবা প্রতি শুক্রবারে বাড়ী আস্‌বেন, আবার রবিবারে রাত্রে চলে যাবেন; বাড়ী থাকাও হবে, কাজও হবে। কি বল পিসিমা?"

আমি বল্‌লাম, "এ উপদেশ আর একজনও দিয়েছেন; সুরেশ ছেলেমানুষ হয়েও সেই কথাই বল্‌ল। তুমি এতে কি বল দিদি!"

দিদি বল্‌লেন, "বেশ, আপাততঃ কিছুদিন তাই করেই দেখ। যদি অসুবিধা হয়, তখন অন্য উপায় স্থির করা যাবে। হাঁারে পরেশ, আজ সকালে কার চিঠি এল রে!"

আমি বল্‌লাম, "ওঃ, তোমাকে একটা সু-সংবাদই দিই নি। অরুণ সংবাদ দিয়েছে, হাইকোর্টে যে মামলা করতে আমি গিয়েছিলাম, তাতে আমাদের জিত হয়েছে। অরুণ লিখেছে, যমুনাদাস বাবু দুই একদিনের মধ্যেই এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। মামলা জিতলে পুরস্কারের কথা ছিল কি না, তাই সে আস্‌ছে। অরুণ আরও লিখেছে যে, আমি কলিকাতার মায়া কাটিয়ে পাটনায় গিয়ে বসি। সেখানে গেলে আমার যে পশার হবে, তা জানি; কিন্তু আর নূতন করে চেষ্টা করবার শক্তি নেই; কল্‌কাতাতেই বেশ আছি। অরুণ বেচারীর ভারি কষ্ট হচ্চে; এই একমাস আমি তার ওখানে ছিলাম, খুব আমোদ-আনন্দে কেটেছিল। এখন বেচারী একেবারে একেলা হয়ে পড়েছে। বাসায় সে আর তার স্ত্রী। আমি যখন ছিলাম, তখন তার এক শ্যালিকা এসে ছিল, সেও কল্‌কাতায় চলে এসেছে; সে ত আর বারো মাস থাক্‌তে পারে না। বেশ মেয়েটী, কলেজে পড়ে, এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। শুন্‌লাম এম-এ দেবে, তার পর বি-এল্ দিয়ে হাইকোর্টে এসে আমাদের পশার একেবারে মাটী করে দেবে।"

দিদি হেসে বল্‌লেন, "মেয়েমানুষের অত পড়াশুনা কিন্তু

আমার ভাল বোধ হয় না। মেয়েরা ওতে মর্দ্দা হয়ে যায়। তারা হয় ত তোর মত উকীল হতে পারে, কি বড় চাকুরী করে টাকা রোজগার করতে পারে, কিন্তু আমাদের যে রকম গৃহস্থালীর ব্যবস্থা এতদিন চলে আস্‌ছে, ও রকম মেয়েরা তা কিছুতেই রক্ষা করে চল্‌তে পারে না; সে শিক্ষাই যে তাদের হয় না। এর জন্য ত তাদের দোষ দিতে পারিনে; দোষ যারা তাদের পুরুষের লেখাপড়া শেখায়। তাই বলে আমি এ কথা বল্‌ছিনে যে মেয়েদের মূর্খ করে রাখ। তা নয়, যে শিক্ষা দিলে তারা মা হতে পারে, জগজ্জননী হতে পারে, গৃহস্থালীতে অন্নপূর্ণার মত অধিষ্ঠান করতে পারে, সেই শিক্ষা যত পার দেও; তাতে মঙ্গল হবে। আমাদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার আছে, তা এই সব শিক্ষিতা মেয়ে দূর করবে; ঠিক সনাতন হিন্দু-গৃহস্থালী হবে।"

আমি হেসে বল্‌লাম, "দিদি! তোমার বর্ণনামত একটা মেয়ের সঙ্গে সুরেশের বিয়ে দিয়ে আমাদের গৃহে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা করব।"

দিদি বল্‌লেন, "নারায়ণ করুন, তাই যেন হয়; তোর বাসনা যেন পূর্ণ হয়।"

(দিদির কথা)

২১

যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাতে প্রথম তিন চারি মাস বেশ চলিল। প্রতি শুক্রবার বাড়ী আসিতে পরেশের একটু কষ্ট হইতেছিল; সেই রেলে কয়েকঘণ্টা আসা, তার পর পাল্‌কীতে আসা; আবার রবিবার রাত্রিতে যাওয়া। ইহাতে তাহার শরীর যে অসুস্থ হয় নাই, ইহাই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু, আপাততঃ এই ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন কথা ত ভাবিয়াও পাইতেছি না।

মাস দুই পূর্ব্বে একদিন পরেশ বলিল, "দিদি, প্রতি সপ্তাহে এমন করিয়া বাড়ীতে আসা-যাওয়ায় আমার যে বিশেষ কোন ক্লান্তি বোধ হচ্চে তা নয়; বরঞ্চ দুই দিন বাড়ীতে থেকে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমোদ-আনন্দ করে,

তোমার কাছে থেকে আমার শরীরে যেন নব-বলের সঞ্চার হয়, আমি কলিকাতায় গিয়ে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে পারি। কিন্তু, আর একটা অসুবিধা হয়েছে। শনি রবিবার আমি কলিকাতায় না থাকায় মক্কেলদের অনেক কাজের ক্ষতি হচ্চে। ছোটখাট মোকদ্দমার কথা ধরিনে; তাতে বেশী সময়ও লাগে না। কিন্তু বড় বড় মামলায় স্তূপাকার কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ দেখ্‌তে হয়; হয় ত একশ বছরের কাগজ ঘাঁটতে হয়। সে সব ত সপ্তাহের পাঁচদিনের মধ্যে করা যায় না। শনি রবিবার কোর্ট বন্ধ থাকে; বড় বড় মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখা, সলা-পরামর্শ করা, সবই সেই দুইদিনে করতে হয়। আমি আজ তিনমাস শনি রবিবার কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকি, এতে মক্কেলেরও অসুবিধা হয়, হয় ত আমারও কাজকর্ম্মের ক্ষতি হতে পারে। দুই চারজন বড় মক্কেল এই সব কথা সর্ব্বদাই বলেন। তাদের অভিযোগ যে সঙ্গত, তার আর সন্দেহ কি। আর আমি ত রাসবিহারী ঘোষ হয়ে বসিনি যে, জঙ্গলে ব'সে থাক্‌লেও সেখানে লোকে প্রাণের দায়ে দৌড়ুবে। আমার মত উকিল ঢের আছে, গণ্ডায় গণ্ডায় মেলে। এ অবস্থায়,

হয় কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ঘরে এসে বস্তে হয়, আর না হয়, বাড়ী আসা কম করতে হয়। এই দুইয়ের একটা শীঘ্রই করা দরকার।"

আমি বলিলাম, "সে কথা যে আমি ভাবিনি, তা নয় পরেশ। তোর একলা থাকা সইয়ে নেবার জন্যই এ ব্যবস্থায় আমি সম্মত হয়েছিলাম। এখন যা বুঝতে পারছি, তাতে তুই একেলাও কলকাতায় থাক্‌তে পারবি। তুই সব গুছিয়ে থাক্‌তে পারিস্ কিনা, দেখ্‌বার জন্য, আর তোকে মাঝে মাঝে সাহায্য করবার জন্যই যখন-তখন রামচরণ দাদাকে কলকাতায় পাঠিয়েছি। সে বলে, এখন তোর তেমন কষ্ট বা অসুবিধা হবে না। কিন্তু এই ছেলেমেয়েগুলো যে তোকে সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাবে না, এই যা কথা। তা দেখ্, এক কাজ করিস, যে হপ্তায় শনি রবিবারে তেমন কাজ হাতে না থাক্‌বে, সেই হপ্তায় আসিস্। আর তোদের হাইকোর্টের ত বার মাসে তের পার্ব্বণ, ছুটী লেগেই আছে। ছুটীর সময় আসিস্। এমনই করে আর কিছুদিন কাট্‌লেই সুরেশের এখানকার পড়া শেষ হয়ে যাবে, তাকে কল্‌কাতায় কলেজে পড়াতেই হবে, তখন যা হয় করা যাবে।"

পরেশ এই ব্যবস্থাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিল। তাহার পর কলিকাতায় গিয়ে পরের সপ্তাহে আর বাড়ী আসিল না; পত্র লিখিল, কাজের বড় ভিড় পড়িয়াছে, অনেকগুলি বড় বড় মকদ্দমা হাতে আসিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সে সপ্তাহে তাহার বাড়ী আসা হইবে না।

সে সপ্তাহ গেল; পরের সপ্তাহেও পরেশ আসিল না, এবারও পূর্ব্বের ন্যায় কারণ দেখাইল। কি করিব, উপায় নাই; পনর দিন তাহার মুখখানি দেখিতে পাইলাম না। তার পরের সপ্তাহে শুক্রবারে মুসলমানদের কি একটা পর্ব্ব-উপলক্ষে সব আদালত বন্ধ। আমি মনে করিলাম, শুক্র শনি রবি তিন দিন যখন বন্ধ, তখন পরেশ বাড়ী আসিবেই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে না আসিবার কারণ দেখাইয়া পত্রও লিখিল না, বা বাড়ীতেও আসিল না। সে ত এমন কখন করে না। তাহার ত অসুখ হয় নাই? না, না, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সংবাদ দিত—সে আমার তেমন ভাই নয়। শুক্রবার গেল, শনিবার যায়-যায়;—পরেশেরও দেখা নাই, কোন পত্রও আসিল না।

তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। রামচরণ দাদা

মহা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। শনিবার সন্ধ্যার পর রামচরণ দাদা বলিল, "দিদি, আমাকে আজ রাত্রির গাড়ীতেই কল্‌কাতায় যেতে হচ্চে। নিশ্চয়ই ভায়ের আমার কোন অসুখ করেছে, আর না হয় সে কোন বিপদে পড়েছে। আমি ত আর থাক্‌তে পারছিনে। এই রাত্রি দেড়টার গাড়ীতেই আমি কল্‌কাতায় যাব। গিয়ে যদি দেখি সে ভাল আছে, তা হলে আমি বিকেলের গাড়ীতেই ফিরে আস্‌ব; আর যদি কোন ভাল-মন্দ দেখি. তা হ'লে কা'ল সকালেই তার করে দেব; তোমরা চলে যাবে।"

তাহাই স্থির হইল। রামচরণদা রাত্রিতেই চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম; মনে হইতে লাগিল, এই এখনই হয় ত তার আসিবে। ভাল কথা আর মনে হয় না, যত মন্দ ভাবনাই মনে আসে। ডাকেও চিঠি আসিল না; বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল, কোন তার আসিল না। আমার ভাবনা একটু কমিল, কারণ কোন কিছু হইলে রামচরণদা নিশ্চয়ই তার করিত। তার যখন আসিল না, তখন রাত্রি আটটা নটার মধ্যেই রামচরণদা আসিয়া পড়িবে।

পরশ-পাথর

আমি সবে দুটী ভাত লইয়া বসিয়াছি, ছেলেরা উপরে ঘুমাইতেছে কি খেলা করিতেছে, এমন সময় রামচরণ দাদা আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে অসময়ে আসিতে দেখিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সব ভাল ত রামচরণদা!"

রামচরণ দাদা আমার সম্মুখে হতাশভাবে বসিয়া শুধু বলিল "হু"।

আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এ কি রকম উত্তর! রামচরণদা ত এমন ভাবে কথা বলে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার রামচরণ দা, তোমার মুখ-চোখ অমন হয়ে গেছে কেন? কি হয়েছে বল?"

রামচরণদা চীৎকার করিয়া বলিল, "হবে আবার কি মাথা আর মুণ্ডু! তোমার ভাই কা'ল রাত্রে বিয়ে করেছেন।"

আমার হাতের গ্রাস হাতেই রহিয়া গেল; আমি তাহার কথা যেন বুঝিতে পারিলাম না; তাই আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিয়ে, বিয়ে—কোথায়?"

রামচরণ দাদা রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "অত খবর নেওয়া আমার দরকার হয় নি। বাসায় সকালবেলা গিয়ে দেখি, রসিক

খানসামা দোরের কাছে বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলিল, বাবু কা'ল রাত্রে বিয়ে করতে গেছেন। আজ নটার মধ্যেই বাড়ী আস্‌বেন। তুমি কি বল, আমি তাই দেখবার জন্য সেখানে বসে থাক্‌ব। আমি আর সে বাড়ীতেও ঢুকিনি; তখনই ইষ্টিশনে এসে বাড়ী চলে এসেছি।"

আমার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না, আমি সুধু বলিলাম, "বেশ!"

২২

এই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "রামচরণদা, ও রামচরণদা, বাড়ী আছ ?"

"কে ডাক্‌ছ ? এদিকে এস না দেখি।"

"আমি নিতাই।"

আমি ডাকিলাম, "ও নিতাই, বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছিস কেন ? ভিতরে আস্‌তে পারিস না। না, তোরাও পর হয়ে গেলি রে !"

নিতাই ভিতরের উঠানে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "এই বেলা দুপুরে কে কোথায় থাকেন, তাই বাইরে থেকে সাড়া দিচ্ছিলাম দিদিঠাকরুণ। একখানা তার আছে, রামচরণদার নামে ; জরুরী তার, তাই দিতে এলাম।"

তার কথাটা শুনিয়াই আমার শরীর কেমন করিয়া

উঠিল। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "তার কোথা থেকে এল রে নিতাই ?"

নিতাই বলিল, "তা ত বল্‌তে পারব না দিদিঠাকরুণ! কৈ, খোকাবাবু কৈ ? তিনি এসে তারটা পড়ে দেখুক না; আমরা ত ইংরেজী জানিনে।"

সুরেশ তখন উপরে ছিল। আমি একটু উচ্চ স্বরে ডাকিলাম, "ওরে সুরেশ, বাবা, একবার নীচে এস ত, একটা তার এসেছে।"

তারের নাম শুনিয়াই সুরেশ তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল, "কৈ, দেখি তার। কে তার করল। জ্যেঠা মশাই, তুমি কখন এলে ? যেতে যেতেই যে চলে এলে ? বাবা এলেন না ?"

আমি বলিলাম, "সে সব কথা পরে হবে, এখন তারটা আগে দেখ! কোথা থেকে তার এল ভেবে ত পাচ্ছিনে।"

সুরেশ তারটা খুলিয়া ইংরাজীটাই চেঁচাইয়া পড়িল। পালকী আর কুলী এই দুইটা কথা বুঝিতে পারিলাম। সুরেশ বলিল, "কোন খারাপ সংবাদ নেই পিসি-মা। বাবা জ্যেঠা মশাইকে তার করেছেন, কা'ল অর্থাৎ সোমবারে বেলা সাড়ে

নটার সময় ষ্টেশনে যেন চারখানি পালকী, একখানি গরুর গাড়ী আর গুটিচেরেক কুলী থাকে। হ্যাঁ পিসি-মা, চারখানা পালকী কি হবে? কারা আস্‌বে। একখানা গরুর গাড়ীতে যে একটা রাজ্য আনা যায়; এত জিনিষ আস্‌বে। তার উপর আবার গুটি চেরেক কুলী। আমি ঠিক বল্‌ছি পিসি-মা, বাবা আর কলকাতায় যাবেন না, তাই যত পারেন, জিনিষ নিয়ে আস্‌ছেন। আচ্ছা, চারখানা পালকীতে কে কে আস্‌বে? জ্যেঠা মশাই, তুমি এই ত কল্‌কাতা থেকে এলে, আবার তার কেন? ও, তুমি কলকাতায় যাওনি, তাই বল; ইষ্টিশেন থেকেই ফিরে এসেছ। তাই বাবাকে তার করতে হয়েছে। জান পিসিমা, এ সাধারণ তার নয়, জরুরী তার; এর জন্ত ডবল টাকা দিতে হয়। আজ যে রবিবার পিসিমা, আজ তার করতে হলে ডবল রেট, মনে থাকে যেন পিসিমা।"

আমি এত ভাবনার মধ্যেও হাসিয়া বলিলাম, "খুব মনে থাক্‌বে বাবা, এমন গুরুতর কথা কি ভুলতে পারা যায়।"

নিতাই বলিল, "দিদি ঠাকরুণ, কি চাকরীই মা দুর্গা আমায় জুঠিয়ে দিয়েছেন; আমি সুধু মন্দ খবরই বাড়ী বাড়ী বিলিয়ে বেড়াই। তারে ভাল খবর প্রায়ই আসে না, সুধু

আসে, অমুক বাঁচেন না, শীগগির এস, অমুক মারা গেছেন, এই সব আর কি। যাক্, দাদা বাবুর তারে যে ভাল খবর এসেছে, সেই ভাল। এখন আসি দিদিঠাকরুণ।"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁরে নিতাই, বেলা ত একটা বাজে, নাওয়া খাওয়া হয়েচে রে?"

নিতাই বলিল, "না দিদিঠাকরুণ, রবিবারে সরকারী কাজ কম হলে কি হয়, মাষ্টার বাবু যে সব কাজ রবিবারের জন্ম জমা করে রাখেন। সেই ভোর ছটায় গিয়েছি, আর এই বারটা পর্য্যন্ত ত তাঁরই কাজ করছিলাম; তবুও শেষ হোলো না। এমন সময় তারটা এল, তাই রক্ষে। আমার উপর হুকুম হোলো তারটা বিলি করে, বাড়ী গিয়ে খেয়ে-দেয়ে ঠিক দুটোর সময় আফিসে হাজির হতে। একটা ত বেজে গেছে; যাই, তাড়াতাড়ি দুটো মুখে দিয়ে আবার চাকরী বাজাতে যাই।"

আমি বলিলাম, "সে কি হয় রে নিতাই, এত বেলায় গৃহস্থের বাড়ী থেকে না খেয়ে কি যেতে আছে? ওতে যে আমার বাছাদের অকল্যাণ হবে রে। যা, নেয়ে আয়, রামচরণ-দার এখনও স্নান-আহার হয় নি। যাও দাদা, তুমিও

স্নান করে এস। নিতাই, এখানেই যা হয় দুটো খেয়ে আফিসে যা।"

নিতাই বলিল, "দিদিঠাকরুণ, আপনাদেরই ত খাচ্চি ; যখন যা দরকার হয়, এসে হাত পাতলেই হোলো ; কোন দিন ত 'হবে না' শুনলুম না। আপনার কথা কি অমান্য করতে পারি। ওঠ রামচরণদা, এক সঙ্গেই ডুব দিয়ে আসি।"

রামচরণদা বলিল, "তুমিই যাও নিতাই ; আমার শরীরটা আজ বড় ভাল নেই, আমি স্নানও করব না, এ বেলা কিছু খাবো'ও না।" এই বলিয়া রামচরণদা উঠিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না, বলিবার কথা যোগাইল না। কি গভীর মনোবেদনায় যে বৃদ্ধ দাদা আমার ভেঙ্গে পড়েছে, তা আমিই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু, উপায় কি! যার প্রতিবিধান সাধ্যাতীত, তাকে সহ্য করেই নিতে হবে, নইলে সংসার যে চলে না।

সুরেশ বলিল, "আচ্ছা পিসিমা, তুমি আন্দাজ কর ত, কা'ল চারখানা পাল্‌কীতে কে কে আসবে।"

আমি বলিলাম, "তোর মাথার মধ্যে বুঝি ঐ চারখানা পালকীই ঘুরচে। আমি কেমন করে এতদূর থেকে আন্দাজ

করব। কা'ল এলেই দেখা যাবে, তার জন্য ব্যস্ত হবার দরকার কি ?"

সুরেশ বলিল, "না, না, ব্যস্ত নয়। তবে কি জান পিসিমা, যদি কোন বড় লোক বাবার সঙ্গে আসেন, তা হ'লে ত সব ঠিক করতে হবে। বাবারই বা কি বিবেচনা ; কারা আস্‌ছে তা বলা নেই, একেবারে চারখানি পাল্‌কী। এ কি কলকাতা যে, বল্‌বামাত্রই সব জিনিস মেলে, কেমন পিসিমা !"

আমি বলিলাম, "শোন ছেলের কথা ! তোকে কিছু ভাবতে হবে না সুরেশ, সে যা হয় আমি করব। নিতাই, আর দেরী কোরো না, যাও, তেল নিয়ে নেয়ে এস। এরই মধ্যে যা দিয়ে হয় দুটো ভাত হয়ে যাবে।"

নিতাই স্নান করিতে গেল। আমি তখন মোক্ষদাকে ডাকিয়া, তাড়াতাড়ি দুই জনের মত ভাত চড়াইয়া দিতে বলিলাম। এতকাল আর বাড়ীতে রাঁধিবার লোক রাখিতে হয় নাই। আমি আর রামচরণদা বাড়ীতে থাকিতাম ; দুজনের মত যা হয়, আমিই করিয়া নিতাম। এখন ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে রহিয়াছে।

তাই রামচরণদা এই বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়ে মোক্ষদাকে নিশ্চিন্তপুর থেকে এনেছে। মেয়েটী বড় ভাল; তিনকূলে তাহার কেহ নাই। বড় কষ্ট পাইতেছিল। আমি তাহাকে মেয়ের মত যত্নে রাখিয়াছি; দুবেলা সেই-ই রান্না করে, ঘরের কাজকর্ম্মও করে। একটী পয়সাও মাহিয়ানা দিতে হয় না, খায়-দায় থাকে। আমি বলেছি, তাকে তীর্থধর্ম্ম করাব; তাইতেই সে মহা সন্তুষ্ট।

রান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, আমি ধীরে ধীরে রামচরণ দাদার শয়নের ঘরে গেলাম। দেখিলাম, দাদা ঘরের মেজের শানের উপর শুইয়া আছে। আমি তাহার কাছে যাইয়া তাহার পার্শ্বে বসিলাম; গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম জ্বর হয় নাই। আমি বলিলাম "রামচরণদা, কার উপর তুমি অভিমান করছ দাদা! পরেশ যে আমাদের ছোট ভাই। আমাদের এই দুই ভাইবোনের কত অপরাধ যে তুমি ক্ষমা করেছ; নইলে এতদিন যে আমরা ভেসে যেতাম। না দাদা, পরেশের উপর তুমি রাগ কোরো না। সে যে এখনও ছেলেমানুষ, তা কি তুমি জান না। যা সে করেছে, তার জন্য মনে দুঃখ করতে পার; আমারও যে মনে বেদনা লাগে নাই, তা

বল্‌ছিনে। কিন্তু তাই ব'লে কি তার উপর রাগ করব। তার শত অপরাধ ক্ষমা করবার জন্যই ত তুমি আমি এখনও বেঁচে আছি দাদা! না, তুমি রাগ কোরো না। তুমি কল্‌কাতায় গিয়ে এমন করে চলে এসেছ, তাই শুনে নিশ্চয়ই তার মনে কত ব্যথা লেগেছে। তাই সে তোমার কাছে ছুটে আস্‌ছে। তুমি কি তাকে আগের মত কোলে টেনে নেবে না? তোমাকে আমাকে না জানিয়ে এ কাজটা করা যে তার পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছে, এ কথা আমি ভুলিনি; তবুও তোমাকে বল্‌ছি দাদা, সে যখন বৌ-মাকে নিয়ে বাড়ী আস্‌ছে, তখন তাদের সব অপরাধ ভুলে হাসিমুখে তাদের কোলে করে নিতেই হবে। এ আমার অনুরোধ রামচরণ দা! এখন উঠে, স্নান করে দুটো ভাত খাও। তার পর, কা'ল সকালে তাদের আস্‌বার ব্যবস্থা কর। চারখানা পাল্‌কীতে কে কে আসবে, আমি ভেবে পাচ্ছিনে; বৌ-মা আস্‌ছেন এ নিশ্চিত কথা; কিন্তু আর দুখানিতে কারা আস্‌ছে। যাক্‌, সে কা'ল দেখা যাবে। আমরা ত সব ঠিক করি। ওঠ দাদা, আর শুয়ে থেকো না।"

রামচরণ দাদা বলিল, "দিদি, সারা পথটা ঐ কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছি। পরেশ, আমাদের পরেশ এমন

অপমানটা আমাদের করল। তাকে যে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি; যেখানে যা ভাল দেখেছি, তাই এনে পরেশকে আর তোমাকে দিয়েছি। কর্ত্তা যে মরবার সময় তোমাদের দুজনকে আমারই হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন, সে কথা কি ভুলতে পারি। তোমার কপাল যখন পুড়ে গেল, তখন আমিই যে বিনোদপুর গিয়ে তোমাকে কোলে করে এ বাড়ীতে এনেছিলাম। গিন্নী তখন তোমাকে আমার হাতে দিয়ে কি বলেছিলেন মনে আছে দিদি! রামচরণ, এ মেয়ে আজ থেকে তোমারই হোলো। তারপর তিনিও স্বর্গে গেলেন। আমি এতকাল তোমাদের নিয়েই আছি। তোমরা দুইজনও রামচরণদাদা ছাড়া আর কাউকে জানতে না। কিন্তু, আজ এ কি হোলো! পরেশ আমাদের না জানিয়ে এমন কাজ করল, একটী কথাও জিজ্ঞাসা করল না। এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই দিদি! সে যদি বলত, রামচরণদা, আমি আবার বিয়ে করতে চাই, আমি কি তাতে আপত্তি করতাম। কিছুতেই না; আমিই তখন উদ্যোগ করে বিয়ে দিতাম। তা না করে সে লুকিয়ে কাউকে না বলে বিয়ে করল। সে ত এমন ছিল না।"

আমি বলিলাম, "বোধ হয় লজ্জায় কথাটা বলতে পারে নাই। তার বিশ্বাস আছে, আমরা তাকে ক্ষমা করবই। তা নইলে, কা'ল বিয়ে হয়েছে, আর আজই সে বৌ নিয়ে বাড়ী আস্‌বার ব্যবস্থা করতে পারত না। আমি ঠিক বলতে পারি, বাঁকিপুরে অরুণের যে শ্যালীর সঙ্গে তার দেখা-শুনা হয়েছিল, বাড়ী এসে যার গুণের কথা কতদিন বলেছে, তাকেই বিয়ে করেছে। সে মেয়েটী না কি বি-এ পাশ, বড়মানুষের মেয়ে, তাদের চালচলন বিলাতী রকম, নামে মাত্র তারা হিন্দু। এমন ঘরের মেয়ে কি আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাক্‌তে পারবে? সে কি আমার এই সোনারচাঁদেদের বুকে তুলে নেবে? এই আমার প্রধান ভাবনা। তা আর ভেবে কি করব, অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। মা-হারা ছেলেমেয়েগুলো যদি বাপকেও হারায়, কি করব। যে কয়দিন আমরা বেঁচে আছি, তাদের দেখ্‌ব; তারপর তাদের অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। রামচরণদা, তুমি অমন করে শুয়ে থেক না, ওঠ; পরেশের সব অপরাধ ভুলে যাও, সুরেশ, মণি, রাণীর দিকে চাও। তারা আস্‌ছে, তাদের ব্যবস্থা কর। বৌ-মা এলে তাকে আদর করে ঘরে তুলতে তোমাকেই হবে।"

রামচরণদাদা উঠিয়া বসিল ; বলিল, "বেশ, তাই হবে, অভিমান অপমান সবই ভুলে যেতে হবে। তুমি কিছু ভেবো না দিদি, যার অদৃষ্টে যা আছে, তাকে তা ভোগ করতেই হবে, কেউ তা খণ্ডাতে পারে না। তুমি যাও, আমি আস্‌ছি। সুরেশকে আজ কিছু বোলো না, কা'ল উপস্থিত মত যা হয় হবে।"

২৩

রামচরণদাদা যে কি মানুষ, তাহা আর বলিতে পারি না। এই ত কলিকাতা হইতে আসিয়া অভিমান করিয়া অনাহারে অস্নানে শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর, যেই আমি সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম, আর তাহার অভিমান রহিল না, শরীরের অবসন্নতা কোথায় চলিয়া গেল; বৃদ্ধের শরীরে যেন নব-বলের সঞ্চার হইল। তখনই উঠিয়া স্নান করিল, নিতাইকে খাইতে বসাইয়া বলিল, "দেখ্ ভাই নিতাই, আজ আর তোর খাওয়াই হোলো না; এত বেলায় যা হয় ক'রে পেটটা ভরে নে। কিন্তু বলে দিচ্ছি, কাল দাদাবাবু বাড়ী আসবে, সঙ্গে আরও দুচার জন ভদ্রলোক আস্‌বে, তুই কা'ল দুপুরে এখানেই খাবি, বুঝলি, ভুলিস্ নে। আমি কিন্তু আর তোকে মনে করে দেবার সময় পাব না। আমার আজ অনেক কাজ।"

আমি বলিলাম, "কি অনেক কাজ তোমার দাদা!"

রামচরণদাদা বলিল, "সে সব তুমি জানবে কি করে। ওগো মোক্ষদা, আমাকে তাড়াতাড়ি হুটো ভাত দেও ত; আমার আর সবুর করবার সময় নেই।"

সত্যসত্যই রামচরণদাদা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিল। তাহার পরই আমাদের মুসলমান চাকর জহিরদ্দী ও রাখাল মাণিককে ডাকিয়া বলিল, "ওরে, আজ আর তোদের আলিস্যি ত্যাগ করবার সময় নেই। দেখ্, বাইরের ঘরটা বেশ করে ঝেড়ে ফেলতে হবে, সতরঞ্চিটা টেনে এনে রোদে দে; সতরঞ্চির যে শ্রী হয়েছে। তা হোক, ওরই উপর একটা চাদর পেতে দিলেই হবে। ঘরের মধ্যে কত আবর্জ্জনা যে হয়েছে! সব পরিষ্কার করতে হবে; বাইরের উঠোন আর এই উঠোনটা ভাল করে ঝাড়বি, একটু খড়-কুটোও যেন না থাকে। আর শোন্ মানুকে, বাইরে যে ফুলগাছগুলো হয়েছে, তারদিকে ত তোদের দৃষ্টিই নেই। এক কাজ কর্, মরা ডাল আর পাতাগুলো সরিয়ে ফেলবি, গাছে বিকেল-বেলা জল দিবি। গোয়াল খুব ভাল করে পরিষ্কার করবি; আর জহিরদ্দী যা যা করতে বলবে, সব

করবি। দেখ্ জহিরদ্দী, নেবুতলার বাগানে বারমেসে যে আমগাছ কটা আছে, তাতে এখনও আম আছে; তার মধ্যে যেগুলো পাকা পাকা দেখ্‌বি, সব পেড়ে আনবি। এখন কি আর আম কাঁঠালের সময় যে, ভদ্রলোকদের পাতে দশটা ফল দেব। আর দেখ্, খিড়কির পুকুরের পূব পাড়ে যে কয়টা কলার কাঁদি আছে, তার মধ্যে একটা পেকেছে, আমি কা'লই কেটে আনতাম। তুই সেটা কেটে আনবি। তার পর পতিতকে বলে আস্‌বি, কা'ল সকালে বড়পুকুরে মাছ ধরতে হবে; সে যেন সাতটার মধ্যে আসে। সব মনে থাক্‌বে ত। বল্ ত, কি কি করতে হবে।"

আমি বলিলাম, "রামচরণদা, সব ওর মনে থাক্‌বে, ভুলে গেলেও আমি ত শুনলাম, আমি মনে করিয়ে দেব। এখন তুমি একটা কাজ কর ত। তোমার ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে থাক। কা'ল সারারাত জেগে কাটিয়েছ, আজ এই এতটা পথ রেলে, তারপর হেঁটে এসেছ; এখন একটু বিশ্রাম কর; ওরাই সব করবে, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।"

রামচরণদাদা বলিল, "বল কি তুমি, ব্যস্ত হব না। ত্রুটী হলে তোমাদের কি, যা লজ্জা এই রামচরণেরই ত হবে। যাক্,

আমি এখন চল্লাম, আমার অনেক কাজ। বিশ্রাম ত রোজই করি।" এই বলিয়া রামচরণ দাদা চলিয়া গেল।

সমস্ত বিকাল-বেলা আর রামচরণ দাদার সাক্ষাৎ মিলিল না; জহিরদা ও মাণিক তাহার সমস্ত হুকুম যথাসাধ্য তামিল করিল। এ দিকে আমিও মোক্ষদাকে চুপে চুপে নূতন বৌয়ের আগমন বার্ত্তা জানাইয়া উপর নীচের ঘরগুলো একটু গোছাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে বলিলাম। সুরেশ, মণি, রাণী আরও না হয় ত দশবার প্রশ্ন করিয়াছে, "পিসি-মা, কারা আস্‌বে গো! কাদের জন্য এসব হচ্চে!" আমার সেই একই কথা "চারখানা পাল্‌কী পাঠাতে বলেছে, নিশ্চয়ই পরেশের সঙ্গে ভদ্রলোকেরা আস্‌ছে; তাই সব ঠিক করে রাখ্‌ছি।" তাহারাও সেই কথাই বুঝিল। কেমন করিয়া তাহাদিগকে বলিব যে, তাহাদের নূতন 'মা' আসিতেছেন। সুরেশ যে কতদিন সেই ভয় করিয়াছে; কত বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছি। আজ যে সত্যই তাহা হইয়াছে, এ কথা আমি তাহাকে বলিতে পারিব না। কা'ল তাহারা সকল কথাই শুনিতে পাইবে, সকলই দেখিতে পাইবে।

রাত্রি প্রায় সাতটার সময় রামচরণ দাদা বাড়ী আসিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সেই চারটের আগে বেরিয়েছ, আর এই সাতটা পর্য্যন্ত কোথায় কি করে ফিরছিলে দাদা!"

রামচরণ দাদা বারান্দার উপর বসিয়া বলিল, "অনেক ঘুরতে হয়েছে দিদি। প্রথমে ত গেলাম পাল্‌কী ঠিক করতে; একখানা দুখানা সব সময় পাওয়া যায়। চারখানা পাল্‌কী গোছাতে দেরী হয়ে গেল। পাল্‌কী বেহারা সব ঠিক করে, আটটার সময় ষ্টেশনে হাজির থাকবার কথা বলে দিয়ে গেলাম ও-পাড়ায় ছলিমের বাড়ী। সে প্রজা; যখন গরুর গাড়ীর দরকার হয়, সেই দেয়। গিয়ে দেখি, সে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে, গায়ে হাত দিয়ে দেখি খুব জ্বর। শুনলাম, আজ তিন দিন জ্বরে পড়ে আছে; ওষুধ ত নয়ই, পথ্যও কিছু পায় নাই। তখন কি করি, বাজারে দোকানে গিয়ে সাবু, মিছরী কিনে, ডাকঘরে গিয়ে কুনিয়ান আটমোড়া কিনি; তার পর ছলিমের বাড়ী গিয়ে তার স্ত্রীকে সব দিই; আর ওর জ্বর একটু কমলেই কুনিয়ান খাওয়াতে বলে, গেলাম জহিরদ্দীর বাবার কাছে। তারও গাড়ী আছে, ভাড়া খাটে। তার গাড়ী ঠিক করে খুব ভোরে বেরিয়ে ষ্টেশনে যাবার কথা বলে তখন মনে হোলো বাজারে যে যেতে হবে। যখন সাবু মিছরী কিনতে

বাজারে গিয়েছিলাম, তখন যদি মনে হোতো তা হলে বাজারের কাজ তখনই শেষ করে আস্‌তে পারতাম। বুড়া হয়েছি দিদি, সব সময় সকল কথা মনে আসে না। তখন আবার ছুটে গেলাম বাজারে। লক্ষ্মীকে বল্‌লাম, কা'ল বেলা নটার মধ্যে সের দুই ভাল সন্দেশ, সের দুই রসগোল্লা আর খানিকটা ক্ষীর তাকে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিতেই হবে। সে বলে, এই সন্ধ্যাবেলা খবর দিলে, এখন দুধ কোথায় পাই যে, ছানা কাটাব। আমি তাকে খবর দিলাম, একটু কষ্ট করে এই ক্রোশখানেক গেলেই সনাতনপুরে গয়লাদের বাড়ী দুধ মিল্‌বে, হয় ত ছানাও মিল্‌তে পারে। তারা যে কালকের জন্য বসন্তপুরের বাবুদের বাড়ীর ব্যাপারে ছানা দইয়ের বায়না নিয়েছে, সে খবর আমি জানতাম। দইয়ের কথা আর বল্‌লাম না দিদি; আমাদের এ-বেলা ত তিন সের দুধ পাওয়া যায়, তারই কিছু দিয়ে দই পাতলেই হবে, ছেলেরা না হয় রাত্রিতে একটু কম দুধই খেল, কি বল দিদি! তার পর লক্ষ্মীকে দুটী টাকা দিয়ে তখনই সনাতনপুরে রওনা করে দিয়ে বাড়ী ফিরিলাম। পথে আস্‌তে আস্‌তেই মনে হোলো জহিরদ্দী যদি পতিতকে খবর দিতে ভুলে গিয়ে থাকে, তা হলে

কা'ল মাছ মিলবে কি করে। পথ থেকেই ফিরে গেলাম পতিতের বাড়ী। সে বল্‌ল জহিরদ্দী তাকে কা'ল সকালে জাল নিয়ে যেতে বলে গিয়েছে। আমি তাকে বলে এলাম, আমি ত সকালে বাড়ী থাক্‌ব না; সে যেন মাছ তোমাকে দেখিয়ে নেয়। এই সব সেরে বাড়ী আস্‌তে এত দেরী হয়ে গেল দিদি!"

আমি বলিলাম, "তোমার এত আয়োজন করবার কি দরকার ছিল বল ত দাদা! তারা ত কুটুম্ব আস্‌ছে না যে, ভাল করে অভ্যর্থনা না করলে নিন্দে হবে।"

রামচরণ দাদা বলিল, "না, না, তুমি বুঝতে পারছ না দিদি, দাদাবাবু বাড়ী এসে যদি কোন ত্রুটী দেখে, তা হলে তার মনে হবে আমরা রাগ করে কোন কিছুই করিনি; তাতে তার মনে কষ্ট হবে। আমরা কি আর তার উপর রাগ করতে পারি। তাই, একটু বেশী করে আয়োজন করতে হল। কে কে সঙ্গে আস্‌ছেন, তাও ত জানিনে।"

আমি বলিলাম, "তুমি যে এই মাত্র বল্‌লে কা'ল সকালে তুমি বাড়ী থাক্‌বে না। সে কি করে হবে, তারা আস্‌ছে, আর তুমি বাড়ী থেকে চলে যাবে, এতে পরেশ যে মনে ব্যথা

পাবে। তার ব্যথার কথা মনে করে এত আয়োজন করছ, অথচ তুমিই যে বেশী ব্যথা তাকে দেবে।"

রামচরণ দা হাসিয়া বলিল, "এই বুঝি তোমার বুদ্ধি। আরে, আমি কি বাড়ী থেকে পালাচ্ছি। আমি তাদের এগিয়ে আনবার জন্য ষ্টেশনে যাব।"

আমি বলিলাম, "এত কষ্ট করবার কোন দরকার নেই দাদা! লোকজন যাচ্ছে; তাতেই হবে। তুমি বুড়ো মানুষ, নাই বা গেলে।"

রামচরণ দাদা বলিল, "না, না, সে কি হয়, আমাকে যেতেই হবে। বাইরে কে ডাক্‌ছে না। কে গো?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আমি রসিক, রামচরণ দা!" রামচরণ দাদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বারান্দা হইতে লণ্ঠন লইয়া বাহিরে গেল এবং তৎক্ষণাৎ রসিককে সঙ্গে লইয়া আসিল।

সে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিতেই আমি বলিলাম, "রসিক, তুমি যে হঠাৎ এসে উপস্থিত। এই ত রামচরণ দা কলকাতা থেকে আজই এসেছে, তার পর পরেশের তারও দুপুর বেলা পেয়েছি। সব ভাল ত রসিক?"

রসিক বলিল, "আজ্ঞে সব ভাল; বাবুরা কাল সকালে

আসছেন, তাই নতুন মা-ঠাকরুণ আমাকে আজই পাঠিয়ে দিলেন।"

আমি বলিলাম, "আহা, এত কষ্ট করে এই রাত্রে তোমার আস্‌বার এমন কি দরকার ছিল, কা'ল পরেশের সঙ্গে এলেই হোতো।"

রসিক বলিল, "নতুন মা-ঠাকরুণ আমাকে আজই পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে একখানা চিঠি দেবার জন্য।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, বেশ করেছ, এখন ঠাণ্ডা হও, বিশ্রাম কর, তার পর চিঠি দেখ্‌ছি।"

রসিক বলিল, "দিদি ঠাকরুণ, আমি উপরে গিয়ে আগে খোকাবাবুদের দেখে আসি, কতদিন তাদের দেখিনি। তাদের জন্য যে প্রাণ কেমন করত দিদি ঠাকরুণ, তা আর কি বল্‌ব। আপনি চিঠি নেন, আমি ওপরে যাই।"

আমি বলিলাম "তাই যাও রসিক, তারাও যখন-তখন তোমার কথা বলে।"

রসিক বলিল, "তা বল্‌বে না, আমি যে তাদের আঁতুড় থেকে কোলে নিয়েছি।" এই বলিয়া রসিক চলিয়া গেল।

রামচরণ দাদা বলিল, "দিদি, আলোটা এগিয়ে দিই, তুমি

তোমার চসমাটা নিয়ে এস ; পড় দেখি কি পত্র এল।"

আমি বলিলাম, "তুমিই আগে পড়ে দেখ না দাদা! তার পর আমি পড়ব।"

রামচরণ-দাদা বলিল, "না, না, সে হয় না। তোমার চিঠি, তুমিই পড়। আমি দেখিগে, বাহিরে সব ঠিক হয়েছে কি না ; চিঠিতে কি লেখা আছে তা তোমার মুখে শুনলেই হবে।" এই বলিয়া রামচরণ দাদা বাহিরে চলিয়া গেল।

২৪

আমি তখন ঘরের মধ্যে যাইয়া তাকের উপর হইতে আমার চসমাখানা আনিয়া পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পত্রখানি এই—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

'দিদি' বলিয়াই সম্বোধন করিতে যাইতেছিলাম; কিন্তু সে অধিকার এখনও সম্পূর্ণভাবে পাই নাই; তাই বিনা সম্বোধনেই পত্র লিখিতেছি।

সর্ব্বাগ্রে আমার একটী নিবেদন আছে। আপনি আপনার ভ্রাতাকে ক্ষমা করিবেন। আমার সহিত তাঁহার পরিচয় অল্প দিনের; আপনি তাঁহার সহোদরা, আপনি তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জানেন। তিনি আপনাদের অজ্ঞাতসারে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় দেব-হৃদয় ব্যক্তির উপযুক্ত হয় নাই, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তাহা হইলেও, তিনি আপনার সহোদর; তাঁহার দুর্ব্বলতা-প্রসূত এই অপরাধ আপনাকে ক্ষমা করিতেই হইবে। তিনি এই ক্ষমা লাভ করিলেই আমি আপনাকে 'দিদি' বলিবার অধিকার লাভ করিব, আপনার দাসীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার গৌরব লাভ করিব।

আমার কথা আপনি আপনার ভ্রাতার নিকট সমস্তই শুনিয়াছেন, এ কথা আমি জানি; তাই আমার কথা কিছুই নিবেদন করিব না, এবং এ পত্রও সে জন্য লিখিত নহে।

তিন চারি মাসের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাতে আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, আপনার ভ্রাতা কয়েকটী কারণে বিশেষ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছেন। তাঁহার প্রধান উৎকণ্ঠা এই যে, তিনি তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতৃহীন সন্তান-গণের লালনপালন, শিক্ষাবিধান ও সর্ব্ববিধ উন্নতির চেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিবেন। তিনি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না; ছেলেমেয়ে কয়টীকে বাড়ীতে রাখিয়া তিনি তাহাদের দেখাশুনা করিতে পারিতেছেন না। ইহার জন্য তিনি নিজেকে মহা অপরাধী মনে করিতেছেন।

তাঁহার দ্বিতীয় উৎকণ্ঠা আপনার জন্য। কোথায় তিনি আপনার ধর্ম্মকর্ম্মের সহায় হইবেন, আপনার সেবার ব্যবস্থা করিবেন ; তা না হইয়া তাঁহার পুত্রকন্যার লালনপালনের ভার আপনার উপর দিয়া আপনাকে বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহার মনে শান্তি নাই।

তাঁহার তৃতীয় চিন্তা তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরাধিক ভক্তির পাত্র তাঁহার রামচরণদাদা। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন ; এ সময় তাঁহার যথারীতি সেবার প্রয়োজন, তাঁহার বিশ্রাম গ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু, তাহার কোন ব্যবস্থা না করিয়া, এই বৃদ্ধের উপর তাঁহার বিষয়কর্ম্ম প্রভৃতির ভার অর্পণ করিয়া তিনি সত্যসত্যই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতেছেন।

তাঁহার এই সকল উদ্বেগের কথা যখন আমি জানিতে পারিলাম, তখন আমি তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতে শিখিলাম ; অবশ্য পূর্ব্বেই তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার বালসুলভ সরলতা আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

আমি বি-এ পাশ করিয়াছি, চেষ্টা করিলে এম-এ পাশও করিতে পারিতাম। আমার জীবন আমি দেশের হিতেও নিয়োজিত করিতে পারিতাম ; আমার জীবনের সম্মুখে অন্য

উচ্চতর লক্ষ্যও উপস্থিত হইতে পারিত ; অথবা আমারই ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণিগণ যেভাবে জীবন কাটান, আমিও আমার জীবন সেইভাবে নিয়োজিত করিতে পারিতাম। কিন্তু, কি জানি কেন, আপনার ভ্রাতার জীবনকে শান্তিময় করিবার বাসনাই আমার প্রবল হইল ; তাহাকেই আমার জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলাম। আমার সহিত ঘনিষ্ঠতাতে তিনিও আমার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

তাহার পর আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত অরুণপ্রকাশ ঘোষ মহাশয় ও আমার ভগিনী আমার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এতবড় একজন উকিলকে, এমন চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে জামাইরূপে পাইতে কাহার না আগ্রহ হয় ? আমার পিতামাতা আত্মীয়বন্ধু সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

আমি বয়স্থা হইয়াছি, শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি ; আমরা হিন্দু হইলেও যে সমাজে আমাদের গতিবিধি, সে সমাজ কন্যার মত গ্রহণের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। আমার নিকট যখন এ কথা উঠিল, তখন আপনার ভ্রাতাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি মতামত প্রকাশ করিতে পারি নাই।

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে স্পষ্ট বলি যে, তিনি যদি কয়েকটী বিষয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি এ বিবাহে সম্মত আছি। সে কথা কয়টি এই—প্রথম, আমি তাঁহার গ্রামে যাইয়া বাস করিব এবং তাঁহার পুত্রকন্যাগণের লালনপালনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিব। দ্বিতীয়, তাঁহার দেবীরূপিণী ভগিনী যতদিন জীবিতা থাকিবেন, ততদিন আমি তাঁহার নিকট থাকিয়া প্রাণপণে তাঁহার শুশ্রূষা করিব। তৃতীয়, তাঁহার সহোদরাধিক ভক্তিভাজন রামচরণদাদার শেষ জীবন যাহাতে বিষয়কর্ম্মে বিব্রত না হয়, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব। আর চতুর্থ, তাঁহার বাসগ্রামের যাহাতে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, গ্রামের মেয়েদের যাহাতে সুশিক্ষা লাভ হয়, সর্ব্বপ্রকারে যাহাতে গ্রামের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করিব।

আপনার ভ্রাতা আমার কয়েকটী প্রস্তাবই সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই আমি আজ তাঁহার সহধর্ম্মিণী ; তাই আমি আপনার দাসীত্বে, রামচরণদাদার সেবায়, পুত্রকন্যাগণের লালনপালনে, গ্রামের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য আগামী কল্য আপনার দ্বারে উপস্থিত হইব। ভগবানের

নামে, আমার পূজনীয় স্বামীর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, কোনদিন আমি আমার সঙ্কল্পচ্যুত হইব না।

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এত কথা বলিতে পারিতাম না, বলাও শোভন হইত না ; তাই এই পত্র লিখিলাম।

আমরা বাড়ী যাইতেছি শুনিয়া আমার ভগিনীপতি অরুণবাবু ও আমার ভগিনীও আমাদের দেব-নিকেতন দর্শনের জন্য যাইতেছেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবিকা—শ্রীঅণিমা দাসী

এই পত্রখানি পড়িয়া আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। লেখাপড়া যৎকিঞ্চিৎ করিয়াছি ; অনেক সাধ্বী মহিলার কথা শুনিয়াছি ; দুইচারিজনের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে ; কিন্তু এমন পত্র কখন পড়ি নাই, এমন স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত কখনও শুনি নাই। এমন পতিপরায়ণতারও পরিচয় কখন পাই নাই ; যে মেয়ে আজন্ম বিলাসের মধ্যে লালিতা-পালিতা, যে মেয়ে নামে হিন্দুসমাজভুক্ত হইলেও কোন দিন নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের সংস্রবে আসিয়াছে কি না সন্দেহ, যে মেয়ে বি-এ পাশ করিয়াছে, এবং পরেশের কাছেই শুনিয়াছি, যে মেয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, ইংরাজী

বাঙ্গালা সংস্কৃতে যার বিশেষ অধিকার, হয় ত আমাদের গ্রামের মত স্থানের সহিত যাহার কোন দিন চাক্ষুষ-পরিচয়ও হয় নাই, সেই মেয়ে কি না সমস্ত বিলাস-বাসনা ত্যাগ করিয়া, কলিকাতার মত সহরকে তুচ্ছ করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীরে আসিতেছে; সুধু আসিতেছে নহে—এখানেই জীবন কাটাইবে বলিয়া আসিতেছে। পরেশের নিকট সে নিশ্চয়ই আমাদের গ্রামের অবস্থার কথা শুনিয়াছে; আমরা যে কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহাও সে নিশ্চয়ই অবগত হইয়াছে। এত জানিয়া-শুনিয়াও সে আমাদের মত দরিদ্র গৃহস্থের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার অংশ গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পরেশকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করিয়া তবে তাহার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু, কেন? এ 'কেন'র উত্তর আমি জানি না। পনর বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া এই বাপ-মায়ের সংসারে আসিয়াছি; এই সংসার-সেবা এই সংসারের মঙ্গল-কামনাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, হরিনামের বর্ম্মে নিজেকে সুরক্ষিত করিয়া জীবনের প্রান্তভাগে

উপস্থিত হইয়াছি। নবীনা যুবতীর মনের কথা কেমন করিয়া বলিব? ধর্ম্মশাস্ত্র ছাড়া অন্য শাস্ত্র পড়ি নাই; সুতরাং অন্য কোন বিষয়েই আমার অভিজ্ঞতা নাই। তবুও মনে হইতেছে, মহত্ব, সরলতা, পবিত্রতার এমন আকর্ষণ যে, তাহাতে খাঁটি মানুষ আকৃষ্ট না হইয়াই পারে না। এই মেয়েটী—এই অণিমা সেই পবিত্রতা সরলতার সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি, ত্যাগের আলোকে মহীয়সী: তাই এই পরশ-পাথরের আকর্ষণে আমার ভাই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, আমার সহোদর পরেশ এই পরশ-পাথরের স্পর্শে সোণা হইয়া গিয়াছে। ভগবান, নারায়ণ, ক্ষমা করিও, আজ কয়েক ঘণ্টা কি মনোবেদনাই ভোগ করিয়াছি; আমার সোণার ভাই পরেশের সম্বন্ধে কত অন্যায় কথাই চিন্তা করিয়াছি। সে অপরাধ তুমি ক্ষমা করিও প্রভু!

এই সকল কথা কতক্ষণ ধরিয়া একমনে ভাবিতেছিলাম বলিতে পারি না, সহসা রামচরণদাদার কথায় আমার চৈতন্য সঞ্চার হইল; রামচরণদাদা বলিতেছে, "যা যা করবার সব ঠিক হয়েছে; কাল সকালে আমি না থাক্‌লেও কোন অসুবিধা হবে না; আমাকে ষ্টেশনে যেতেই হবে।"

আমি বলিলাম, "রামচরণ দাদা, স্বধু তোমাকে যেতে হবে না ; আমার ইচ্ছা করছে আমিও ষ্টেশনে গিয়ে দেবী-বরণ করে নিয়ে আসি। কিন্তু, তা ত সম্ভব হবে না। দেখ, এক কাজ কর, জহিরদ্দীকে এখনই পালকীওয়ালাদের ওখানে পাঠিয়ে দেও ; তাদের যেন বলে আসে যে, তারা ভোরে এখানে আস্‌বে ; এখান থেকে সুরেশ, মণি আর রাণীকে নিয়ে ষ্টেশনে যেতে হবে ; তারপর আসবার সময় চারখানা পাল্‌কীতে কোন রকমে সবাইকে নিয়ে আস্‌বে।"

রামচরণদাদা বলিল, "তোমার এ মত কেন হোলো দিদি !"

আমি বলিলাম, "কেন হোলো, তা মুখে বলবার শক্তি আমার নেই। এই চিঠিখানা পড়ে দেখ।" এই বলিয়া অণিমার চিঠিখানি রামচরণদাদার হাতে দিলাম। বারান্দার একপার্শ্বে একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছিল ; রামচরণ দাদা সেই আলোটা আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বিনা চস্‌মাতেই অণিমার পত্রখানি পড়িল। পড়া শেষ করিয়া পত্রখানি মাথায় স্পর্শ করিল, তাহার পর নতজানু হইয়া প্রণাম করিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, বৃদ্ধ তাহার ভ্রাতৃবধূর দেবীত্বের নিকট মস্তক অবনত করিল। তাহার

পর বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "দিদি, গীতা ভাগবতের কথা যা শুনে এসেছি, সে সব দেবতাদেরই সম্ভব হয় বলে এতদিন মনে করে এসেছি; মানুষে তা ঘটে না। কিন্তু এ যে সাক্ষাৎ ভগবদ্গীতা। তাই নমস্কার করলাম। ধন্য পরেশ, ধন্য তুমি দিদি! আর ধন্য হয়ে যাবে এই অধম রামচরণ! এমন করুণাময়ী এতদিন কোথায় ছিলেন? বেশ, এখনই পালকী-ওয়ালাদের ওখানে লোক পাঠাচ্ছি। সেই ব্যবস্থাই হবে। আর দেখো দিদি, এই বুড়ো রামচরণ কা'ল তোমার ঐ সব পালকীওয়ালাদের পেছনে রেখে সকলের আগে এসে বাড়ীর দোরে বৌমাকে কোলে করে নামাবে। তুমি দেখে নিও।" রামচরণ দাদা আর দাঁড়াইল না, 'ওরে জহিরদ্দী, বেটা সাড়াও যে দেয় না' বলিতে বলিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

আমি তখন করযোড়ে প্রার্থনা করিলাম, "নারায়ণ, এই পরশ-পাথরের স্পর্শে যেন সব সোণা হয়ে যায় প্রভু!"

কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিল, আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, "তথাস্তু!"

২৩

প্রায় দুই বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

একদিন বিকাল বেলা আমি দোতালার বারান্দায় বসিয়া আছি, এমন সময় অণিমা একখানি টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, কি খাওয়াবে বল, সুসংবাদ এনেছি।"

নীচে হইতে নিতাই চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই দিদি-ঠাকরুণ, খবর আমি এনেছি ; বৌ-মা তাতে ভাগ বসাচ্ছেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কোন ভয় নেই তোর নিতাই, তোর পাওনায় ও ভাগ বসাবে না। সুরেশ পাশ হয়েচে, এই ত খবর কেমন ?"

অণিমা বলিল, "শুধু পাশ নয় দিদি, একেবারে ফার্ষ্ট ডিবিসনে ফার্ষ্ট; কুড়ি টাকা স্কলারসিপ পাবে।"

আমি বলিলাম "এ খবরে নূতন কিছুই নেই অণিমা। হেডমাষ্টার বাবু ত বলেই গিয়েছেন, সুরেশ সকলের উপর হয়ে পাশ হবে; আর সে তোমারই শিক্ষার গুণে।"

অণিমা বলিল, "সে তাঁদের বাজে কথা; তাঁরাই যত্ন করে পড়িয়েছেন, তাই ও এমন ভাল করে পাশ করেছে। আমি ওর এ পাশের জন্য কিছুই তেমন করিনি; তবে আমি ওর ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে যা হয় একটু করেছি বটে। দেখ দিদি, সুরেশকে আর কলকাতায় পড়ানো হবে না; ওকে বিলেত পাঠাতে হবে। তোমাকে আমি বলিনি এতদিন; আমি ওকে যা শিখ্‌বার সাহায্য করেছি, সে বিলেতে গিয়ে ডাক্তারী পড়বার জন্য। ও ডাক্তার হয়ে না আসা পর্য্যন্ত আমাদের এই রামচরণ-দাতব্য-ডাক্তারখানার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতেই পারছিনে।"

আমি বলিলাম, "ও সব তুমিই ভাল বোঝ অণিমা, তোমরা যা স্থির করবে তাই হবে।"

অণিমা বলিল, "ওকে যদি মাস দুইয়ের মধ্যে বিলেত

পাঠানো হয়, তা হলে মণি আর রাণীকে এখানে রেখেই পড়িয়ে শুনিয়ে যা হয় করতে পারি।"

আমি বলিলাম, "বেশ, তাই কোরো। পরেশ কি আজ আস্‌ছে।"

অণিমা বলিল, "দাদা ত তাই বললেন। দেখ দিদি, বালিকা-বিস্থালয়ের ভারটা কিন্তু তোমাকে নিতে হচ্চে; অন্ততঃ একটা বছরের জন্যে। তা হ'লে বড় ভাল হয়।"

আমি বলিলাম, "কি ভাল হয়?"

অণিমা বলিল, "আমার ভারি ইচ্ছে হয়েছে, আমি তোমার সঙ্গে বসে শাস্ত্র-গ্রন্থ পড়ি। দুপুর-বেলা মেয়ে-স্কুলে যে ঘণ্টা দুই যাই, সেই সময়টা তোমার সঙ্গে বস্‌তে চাই। আমাকে একটু বলে দিয়ে তুমি যদি মেয়েদের কাছে এই আধঘণ্টা কি ঘণ্টাখানেকের জন্য বোসো, তা হলে অনেক কাজ হয়।"

আমি বলিলাম, "শোন পাগ্‌লীর কথা, আমি তোমাকেই বা কি শিখাব আর মেয়েদেরই বা কি বলব।"

অণিমা বলিল, "অমন কথা বোলো না দিদি, এই যে সব হোলো, এই যে দুই বছরের মধ্যে সাত হাজার টাকা খরচ